একক ৩৭ ❑ কপালকুণ্ডলা ঃ উপন্যাস পাঠ

গঠন

৩৭.১ উদ্দেশ্য

৩৭.২ প্রস্তাবনা

৩৭.৩ 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনীর উৎস সন্ধানে

- ৩৭.৩.১ কাহিনী সংক্ষেপ
- ৩৭.৩.২ 'কপালকুণ্ডলা' উপসংহার
- ৩৭.৩.৩ কাহিনী-বিশ্লেষণ

৩৭.৪ উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

- ৩৭.৪.১ উপকাহিনীর অন্যান্য উপযোগিতা
- ৩৭.৪.২ 'কপালকুণ্ডলা'র উপকাহিনী
- ৩৭.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

৩৭.৫ 'কপালকুণ্ডলা'র বৃত্তগঠন

৩৭.৬ 'কপালকুণ্ডলা'র অতিপ্রাকৃত উপাদান

৩৭.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

- ৩৭.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ
- ৩৭.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনী
- ৩৭.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

৩৭.৮ সার-সংক্ষেপ

৩৭.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি

- ৩৭.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার
- ৩৭.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা
- ৩৭.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি
- ৩৭.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

৩৭.১০ সার-সংক্ষেপ

৩৭.১১ 'কপালকুণ্ডলা'র শ্রেণীবিচার

- ৩৭.১১.১ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্য
- ৩৭.১১.২ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি উপন্যাস
- ৩৭.১১.৩ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি রোমান্স
- ৩৭.১১.৪ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

৩৭.১২ সারাংশ

৩৭.১৩ অনুশীলনী
৩৭.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী
৩৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী
৩৭.১৫ উত্তরমালা
৩৭.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর উত্তরমালা

৩৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যানভাগ কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, এই কাহিনীর কতখানি বাস্তব ঘটনা, কতটা লেখকের নিজস্ব কল্পনা সে বিষয়ে জানতে পারবেনঙ্গ
- কাহিনীর উপস্থাপনায় বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রাবলীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা জানতে পারবেনঙ্গ
- কাহিনীর সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত নির্মাণ রীতি এবং অতিপ্রাকৃত ও বাস্তব উপাদানের অনুপাতিক বিন্যাসে কিভাবে একে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে পারবেনঙ্গ
- কাহিনীতে প্রধান পাত্রপাত্রী এবং অপ্রধান চরিত্রাবলী কী ভূমিকা পালন করেছে, তা বুঝতে পারবেনঙ্গ
- উপন্যাসের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী 'কপালকুণ্ডলা'র বৈশিষ্ট্য বিচার করতে পারবেনঙ্গ

৩৭.২ প্রস্তাবনা

একটি উপন্যাসকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলে আলোচনার আওতায় আনা প্রয়োজন মূলতঃ তিনটি বিষয়—এর কাহিনী অংশ, এর চরিত্রনির্মাণ এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতিঙ্গ উপন্যাসের গল্পটি পরিবেশিত হয় নানা ঘটনার কার্যকারণে শৃঙ্খলে বাঁধা থেকে, বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপকে অবলম্বন করে, লেখকের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনার আলোকে আলোকিত হয়েঙ্গ উপন্যাস পাঠের সময় তাই আপনাদের এই তিনটি প্রধান বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যকঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী কিছুটা বাস্তব, কিছুটা লেখকের কল্পনা এবং নিজস্ব জিজ্ঞাসাপ্রসূত ঘটনাঙ্গ এর চরিত্রাবলীও কখনও বাস্তব মানুষের আদলে নির্মিত, (নবকুমার) কখনও অন্য সাহিত্যিক-প্রেরণাসঞ্জাত (কপালকুণ্ডলা), কখনও আবার ইতিহাসসম্ভাব্য (মতিবিবি)ঙ্গ এরা অধিকাংশ সময়েই আমাদের পরিচিত মানবজগতের সে। সদৃশ, যদি বা এরা কখনও ভিন্ন পথে বিচরণ করে, তবে সেটি লেখকের নিজের দর্শন, মতামত, উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েইঙ্গ আসুন, উপন্যাসটির সামগ্রিক বিশ্লেষণে আমরা এর কাহিনী, চরিত্রায়ণ এবং লেখকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ব্যাপারটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করিঙ্গ

৩৭.৩ 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীর উৎস সন্ধানে

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি এমনই একটি সৃষ্টি যে বহু সমালোচকই এর উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেছেনঙ্গ সেই সময়ের এবং পরবর্তী কালের অনেক আলোচকই মনে করেন, এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসঙ্গ এই উপন্যাস যে

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তা বোঝা যায় বহুভাষায় এর অনুবাদ দেখেঙ্গ ইংরেজিতে অনুবাদ তো বেশ কয়েকবার হয়েছে তা ছাড়া ১৮৮৬ সালে অধ্যাপক ক্লেম জার্মান ভাষায় এটি অনুবাদ করেনঙ্গ ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছেঙ্গ এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে এটি মঞ্চস্থ করেন প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে অন্য নাট্যকারও এর নাট্যরূপ দিয়েছেনঙ্গ এর কাহিনীটি তখন এতই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল যে অপর একজন সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই এদের নিয়ে আবার নতুন করে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম 'মৃন্ময়ী'ঙ্গ এ থেকেই বুঝতে পারবেন তখনকার সাহিত্যিকরাও এই উপন্যাস পড়ে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেনঙ্গ

এই যে সকলে মুগ্ধ হচ্ছেন উপন্যাস পড়ে, সেতো লেখার গুণে বটেই, কিন্তু এর বিষয়টাও এমন অভিনব যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় এমন একটা চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র পেলেন কোথা থেকেঙ্গ এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের লেখা 'বঙ্কিম-প্রস।' গ্রন্থেঙ্গ তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়াতে (এখন যা কাঁথি নামে পরিচিত) বদলি হন তখন তাঁর সমুদ্র তীরের বাংলোতে প্রতিদিন গভীর রাতে এক কাপালিকের উদয় হতোঙ্গ সে থাকতো সমুদ্রতীরের গভীর জ।লেঙ্গ এই কাপালিককে নিয়ে তিনি যে বেশ চিন্তা ভাবনা করতেন সে কথা বোঝা যায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে করা একটি প্রশ্ন থেকে—'যদি শিশুকাল হইতে যোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?'

প্রান্তলিপি

এই উপন্যাসের বিষয় এতোই নতুন রকমের মনে হয়েছে যে লণ্ডন থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে আর. ডাব্লিউ ফ্রেজার কী দারুণ প্রশংসা করেছেন এর, সেটাও আপনাদের জেনে রাখা দরকারঙ্গ তিনি লিখেছেন—"Outside in 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history to western fiction."

এ প্রশ্নের উত্তর দীনবন্ধু মিত্র কিছু দেননি, দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, তিনি বলেছিলেন—'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবেঙ্গ পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবেঙ্গ' এই মন্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ হয়নি, পূর্ণচন্দ্র তাঁর গ্রন্থেই সে কথা বলেছেনঙ্গ উপন্যাসটি পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন, পূর্ণচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছেনঙ্গ কিন্তু সমাধান যেরকমই হোক, সমস্যাটা যে বেশ অভিনব তা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছেঙ্গ খানিকটা এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় কালিদাসের সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-য়ঙ্গ সেখানে আশ্রমে প্রতিপালিতা শকুন্তলা কণ্বমুনি আর আশ্রমবালক ছাড়া অন্য কোন পুরুষ চোখে দেখেনি, প্রথম দেখল রাজা দুষ্মন্তকেঙ্গ শেক্সপীয়রের 'দা টেম্পেস্ট' নাটকে মিরান্ডারও প্রায় এই ভাবেই নির্জন দ্বীপে শৈশব কেটেছেঙ্গ সমালোচক ফ্রেজার যে উপন্যাসটির নাম করেছেন, সেই উপন্যাসের লেখক পিয়ের লোতিও দেখিয়েছেন এইরকম একটি মেয়েদের দ্বীপে প্রথম পুরুষের আগমনঙ্গ যাইহোক, সংক্ষেপে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীটা আপনাদের জানিয়ে রাখি, যাতে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যার কী সমাধান করলেনঙ্গ

৩৭.৩.১ কাহিনী-সংক্ষেপ

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির কলেবর খুব বেশি নয়, গল্পে নাটকীয় উত্থান পতন থাকলেও কাহিনী খুব জটিল নয়ঙ্গ নবকুমার এই কাহিনীর নায়কঙ্গ সপ্তগ্রামে তার বাড়িঙ্গ মূল ঘটনা আড়াইশো বছর আগেকার কথা, তাই সপ্তগ্রাম তখন জ।লাকীর্ণ ভূমিঙ্গ গ।াসাগরের মেলা থেকে ফেরবার সময় দিগ্‌ভ্রান্ত একদল যাত্রীর মধ্যে নবকুমারও ছিলঙ্গ কোনরকমে একটা চরে নৌকা ভিড়লে রান্নার উদ্যোগ শুরু হলঙ্গ কাঠ নেই বলে নবকুমার একা গেল কাঠ কাটতে, কিন্তু তার আগেই জোয়ারে নৌকা ভেসে গেলঙ্গ নবকুমার সেই চড়ে পরিত্যক্ত হলঙ্গ

সেই চরে থাকতো এক কাপালিক আর একটি যুবতী মেয়ে কপালকুণ্ডলাঙ্গ আসলে সে ব্রাহ্মণকন্যা, দৈবদুর্ঘটনার অতি শৈশবে সেই চরে নির্বাসিতঙ্গ কাপালিক নিজের স্বার্থেই তাকে লালন করেছেঙ্গ কাপালিক বধের জন্য একটি মানুষ পেয়ে খুব খুশি, নবকুমারকে বন্দী করে রাখলঙ্গ কিন্তু কপালকুণ্ডলার মায়া হল, সে তাকে মুক্ত করে নিয়ে এল ভৈরবী মন্দিরে পুরোহিত অধিকারীর কাছেঙ্গ কাপালিকের রোষ থেকে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাবার জন্য অধিকারী নবকুমারের সে। তার বিয়ে দিয়ে তাকে সপ্তগ্রাম পাঠাবার জন্য মেদিনীপুর পর্যন্ত দিয়ে এলেনঙ্গ

সপ্তগ্রাম যাবার পথেই দেখা হয় নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মবতীর সে।, কিন্তু নবকুমার তাকে চিনতে পারে নাঙ্গ পাঠানের হাতে পড়ে পদ্মাবতীর পরিবারের সকলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বলে নবকুমারের সে। তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছেঙ্গ পদ্মাবতী লুৎফা-উন্নিসা নাম নিয়ে মোগল রাজদরবারে সেলিমের খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছেঙ্গ বাইরে, তার নাম মতিবিবিঙ্গ কপালকুণ্ডলার সে। তার পরিচয় হয়, গা ভর্তি গহনা সে দেয় কপালকুণ্ডলাকে, কপালকুণ্ডলা তা আবার দান করে ভিখারীকেঙ্গ

অচেনা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলে যে ধরনের সমস্যা হবার কথা, তা হয়না, নবকুমার জীবন্ত ফিরে আসার আনন্দে সব চাপা পড়ে যায়ঙ্গ কিন্তু কিছু দিন পার নবকুমারের বিবাহিতা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর সে। কথোপকথনে বুঝি, কপালকুণ্ডলার কোন পরিবর্তন হয়নি, আগের জীবনই তার কাম্য ছিলঙ্গ

এরপর কাহিনী কপালকুণ্ডলাকে ত্যাগ করে মতিবিবির আখ্যান বর্ণনা করতে বসেঙ্গ সেলিম বা জাহা।ীরের প্রধানা মহিষী রাজা মানসিংহের ভগিনী এবং সেই ভগিনীর প্রধানা সহচরী হিসাবে লুৎফা-উন্নিসা সেলিমকেও তৃপ্তি দান করতোঙ্গ আকবর মৃত্যুশয্যায় বলে সেলিমই সিংহাসনের দাবিদার ছিলেনঙ্গ কিন্তু সেলিম যে গোপনে শের আফগানের স্ত্রী মেহের-উন্নিসার প্রতি প্রণয়াসক্তা, সে কথা জানতো মতিবিবিঙ্গ ফলে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার একটা ষড়যন্ত্র করে সে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ঙ্গ এরপর মেহের-উন্নিসার কাছে গিয়ে সেলিম সম্বন্ধে তার মন জানতে চেষ্টা করে মতিবিবিঙ্গ শেষে মেহের ঘোর প্রণয়াসক্তঙ্গ সে কথা সেলিমকে সে জানালে সেলিম অবশ্য উপপত্নী হিসাবে তাকে কাছে রাখতে চায়, কিন্তু সে নিজের স্বামীর ওপর অধিকার কায়েম করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বিতাড়িত করতে সপ্তগ্রামে আসেঙ্গ এর কাপালিককেও সেখানে পেয়ে গেলঙ্গ দুজনের উদ্দেশ্য একইঙ্গ

এক বছরের বিবাহিত জীবন কাটার পর কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্তন হলেও বিশেষ পরিবর্তন হয়নিঙ্গ শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে তার প্রতি অনুরক্ত করার জন্য বন থেকে গভীর রাতে ওষুধ খোঁজার জন্য পাঠায় মৃন্ময়ী বা কপালকুণ্ডলাকেঙ্গ মতিবিবি ও কাপালিকের পরামর্শ শুনে ফেলে সে, কাপালিককে দেখেও ফেলে এক

ঝলকঙ্গ স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা নিজের নিয়তি দেখতে পায়ঙ্গ ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবি চিঠি দেয় তাকে আবার দেখা করার জন্যঙ্গ সেই অনুযায়ী সে যায়, কিন্তু সেই চিঠি নবকুমারের হাতে পড়লে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠেঙ্গ গভীর রাতে কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করতে যাওয়ার কাপালিকের সে। দেখা হয়ঙ্গ ভগ্নবাহু কাপালিক মৃণ্ময়ীকে ভৈরবীর কাছে বলিদানে নবকুমারের সাহায্য চায় এবং মদ্যপানে তাকে উন্মত্ত করে ব্রাহ্মণকুমারের সে। মৃণ্ময়ীর মিথ্যা দ্বিচারিতার দৃশ্য দেখায়ঙ্গ নবকুমারই মৃণ্ময়ীকে বধ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাড় ভেঙে মৃণ্ময়ী জলে পড়েঙ্গ নবকুমার তাকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপ দেয়ঙ্গ দুজনেই তলিয়ে যায়ঙ্গ

৩৭.৩.২ কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যটি এইরকম ছিল—'সেই অনন্তগ।প্রবাহ মধ্যে, 'বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'

এটা কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণে আছেঙ্গ আপনারা সন্ধান করলে দেখতে পাবেন, প্রথম সংস্করণে অর্থাৎ উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এর পরেও খানিকটা অংশ ছিলঙ্গ সেই অংশটুকু এইরকম ঃ ''(কাপালিক) লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কুলে তুলিলেনঙ্গ দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহঙ্গ অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্ন আছেনঙ্গ পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন নাঙ্গ

তীরে পুণরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেনঙ্গ নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিঃশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইলঙ্গ সে বাক্য কেবল 'মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!'

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃণ্ময়ী কোথায়?' নবকুমার উত্তর করিলেন, 'মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি!'

এই দুটি উপসংহারের মধ্যে কোন্‌টি আপনাদের মতে সুন্দর এবং যুক্তিসংগত, ভেবে দেখতে পারেনঙ্গ আমার বিবেচনায়, শাস্তি যদি পেতেই হয়, দুজনেরই পাওয়া উচিত, একা কপালকুণ্ডলার নয়ঙ্গ তাছাড়া অন্যায় তো বেশি করেছে নবকুমারইঙ্গ কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকার করবার জন্যই বেরিয়েছিল, আগের দিন কাপালিককে দেখা সত্ত্বেও; কথা বলেছিল ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সে।ঙ্গ অথচ সেই অপরাধে নিজে তাকে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে নবকুমার কাপালিকের নির্দেশ অনুসারে তাকে বলি দিতে গিয়েছিলঙ্গ বিনা অপরাধে মৃণ্ময়ীর মৃত্যু যদি ঔপন্যাসিক দেখাতে পারেন, তবে অপরাধ করে নবকুমারের বেঁচে যাওয়া পাঠক হিসাবে আমাদের কিছুতেই যুক্তিসংগত হতো না বলে মনে হয়ঙ্গ তাই, মনে হয় আপনারাও একমত হবেন যে, বর্তমান সমাপ্তিটিই উপন্যাসের পক্ষে সঠিক হয়েছে—যা হবার দুজনের একসে।ই হয়েছে, এবং সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়ঙ্গ

৩৭.৩.৩ কাহিনী-বিশ্লেষণ

আপনারা উপসংহার নিয়ে যেরকম ভাবনাচিন্তা করলেন, সেই ভাবেই একবার ভাবতে পারেন গোটা কাহিনীটা নিয়েঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় যে চিন্তাটা এসেছিল, আমরা তা জানিঙ্গ সেই চিন্তাটাকে রূপ দেবার জন্যই তিনি 'রসুলপুরের নদীর' বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি এবং অরণ্যসংকুল অঞ্চলে মৃণ্ময়ীর আশৈশব প্রতিপালনের কথা ভেবেছিলেনঙ্গ কোনসময় নৌকাডুবি হয়ে একটি শিশু সেখানে উপস্থিত হতেই পারে এবং কাপালিক তাকে আশ্রয় দিয়েছে এমন ঘটনাও স্বাভাবিকঙ্গ মৃণ্ময়ী বা কপালকুণ্ডলা কখনই কোন যুবা-পুরুষের মুখ দেখেনি,

এটা অবশ্য ঠিক নয়—অধিকারীর শিষ্যেরা কখনও কখনও এসেছেঙ্গ তবে সভ্য সমাজের নিয়মকানুন জানা বা স্বামী ও বিবাহ সম্বন্ধে কোন ধারণা তার অবশ্য থাকার কথা নয়ঙ্গ

নবকুমার সেইরকম একটি জায়গায় নিতান্ত পরিস্থিতি বিপর্যয়েই গিয়ে পড়েছিল এবং যেরকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল তাতে নবকুমারের সঙ্গে। তার বিয়ে দিয়ে তাকে সভ্য সমাজে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া অধিকারীর আর কিছু করবারও ছিল না বোধ হয়ঙ্গ অর্থাৎ এইরকম একটি লোকালয় ও সভ্য সমাজের সংস্রব বর্জিত মেয়ের বিয়ে দেওয়া হলঙ্গ

এরপরে যা হতে পারে বলে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন তা যে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি, সেটা আমরা পরবর্তী কাহিনী থেকেই বুঝতে পারিঙ্গ মৃণ্ময়ীকে পেয়ে নবকুমার যে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখতে লাগল, সব কিছুই তার কাছে সুন্দর হয়ে গেল, এ কথা লেখক বলেছেন, কারণ—'প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করেঙ্গ'

অথচ কপালকুণ্ডলার তিলমাত্র পরিবর্তন এই প্রণয় ঘটাতে পারেনিঙ্গ নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরী তাকে সুন্দর করে চুল বেঁধে দিতে চেয়েছে, অলংকারে ভূষিত করতে চেয়েছে, এমন কী সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে', একথাও বলেছে, তার পরেও কপালকুণ্ডলা বলেছে, 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মেঙ্গ'

আমরা বিবাহের এক বছর পরেও কপালকুণ্ডলাকে দেখেছিঙ্গ তখনও সংসারের দিকে তার কোন মন নেই, নবকুমারের প্রতি বিশেষ প্রণয় নেই, দাম্পত্য জীবনেও কোন লোভ নেইঙ্গ কাজেই মনে হয় জীবনের প্রথম ষোল বছর এইভাবে কাপালিকের কাছে লালিত হলে সংসার আর তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না, এইরকম একটা চিন্তাই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিলঙ্গ অন্তত কাহিনী থেকে সেরকমই মনে হয়ঙ্গ চরিত্রের পক্ষে এই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা আমরা কিছুটা পরে বিচার করবোঙ্গ এখন একটা অন্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যাকঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র যে চিন্তার কথা উপন্যাস লেখার আগে কারো কারো কাছে খুলে বলেছেন সেখানে কিন্তু শুধু মেয়েটির কথাই ছিল, তাকে বিবাহ করে যে সভ্যসমাজে নিয়ে যাবে তার আর একপক্ষ আগে ছিল, কিম্বা তার বিবাহিত বোনকে স্বামী বিশেষ সম্মান বা ভালবাসা দেয় না, এসব কথা ছিল নাঙ্গ এসব যে উপন্যাসে এসেছে, তাই নয়, কপালকুণ্ডলার জীবন এবং পরিণতির সঙ্গে। এরা একেবারে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছেঙ্গ এটা কেন হল, আপনাদের একটু চিন্তা করে দেখতে হবেঙ্গ

৩৭.৪ উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

যে কোন উপন্যাস লেখার সময় মূল কাহিনী তো একটা থাকেই, কিন্তু সেই সঙ্গে। অপ্রধান আরো দুটো-একটা গল্প লেখক সুন্দর ভাবে জুড়ে দেন তার সঙ্গে, এমন ভাবে যাতে মূল গল্পের সঙ্গে। বেশ মসৃণভাবে মিশে যেতে পারেঙ্গ কেন তিনি এমন করেন? উপন্যাসটা একটু মোটাসোটা করবার জন্য? পাঠকের কৌতূহল আরো বাড়িয়ে তুলবার জন্য?

এমনিতে প্রশ্ন দুটো যতোই শুনতে কেমন মোটা দাগের হোক না কেন, এ কথাগুলোও কিন্তু মিথ্যে নয়ঙ্গ উপন্যাসটাকে বেশ খানিকটা কলেবর তো দিতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস বলে মনে হবে কেন! এখন আমাদের আলোচ্য এই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল, সেই প্রশ্নের রূপায়ণ কিন্তু তিনি প্রথম দুটি খণ্ডেই, অর্থাৎ পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই করে ফেলেছেন—অর্থাৎ লোকালয়বর্জিত স্থানে একটি মেয়ের বেড়ে ওঠা দেখালেন, অবস্থা বিপাকে তাকে বিবাহ করে সভ্যসমাজে নিয়ে আসা দেখালেন, দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে সে মেয়ের কোন পরিবর্তন হল কিনা তাও তিনি দেখিয়ে ফেললেনঙ্গ সব কিন্তু ওই পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই, যে উপন্যাসের বর্তমান কলেবর হচ্ছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদঙ্গ তাও প্রথম পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে মতিবিবিঙ্গ কাজেই মতিবিবিকে বাদ দিলে, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে তো মতিবিবির কোন প্রস।ই ছিল না, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস কেন খণ্ডোপন্যাসের আয়তনও পেত কি না সন্দেহঙ্গ

দ্বিতীয় কথাটা ছিল পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলাঙ্গ তার জন্যেও তো নিশ্চয়ই গৌণ কিছু গল্প মূল কাহিনীর সে। জুড়ে দেবার দরকার হতেই পারেঙ্গ 'কপালকুণ্ডলা'র গল্পটাই যখন সদ্য আমরা জেনেছি তখন তার কথাটাই আর একবার ভাবা যাকঙ্গ একেবারে প্রথম দিকটা পাঠকের খুবই কৌতূহল ছিল, একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাও ছিল—কাপালিকের হাতে ধরা পড়ার পর নবকুমার উদ্ধার পায় কি নাঙ্গ যখন কপালকুণ্ডলাই তাকে বাঁচিয়ে দিল, অধিকারী তার সে। নবকুমারের বিয়ে দিয়ে তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তখন আমাদের কৌতূহলের বিষয় এইবার কপালকুণ্ডলা বা মৃণ্ময়ী একটি সাধারণ নারীর অনুভূতিগুলি লাভ করবে, নাকি আগেকার মত বন্যস্বভাবেরই থাকবেঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেখা গেল নবকুমার কপালকুণ্ডলার জন্য পাগল হলেও কপালকুণ্ডলার মনে নবকুমার বা এই সংসারের জন্য কোনরকম আকর্ষণ তৈরি হয়নি—এমনকী সাধারণ নাগরিক মেয়ের মত চুলবাঁধা বা সাজসজ্জার ব্যাপারেও তাকে রাজি করানো যাচ্ছে নাঙ্গ পাঠকের কৌতূহলকে এবার কী দিয়ে জাগ্রত করবেন বঙ্কিমচন্দ্রঙ্গ অপ্রধান গল্প তো তাকে খুঁজতেই হবেঙ্গ এই ধরনের অপ্রধান গল্পগুলিকে উপন্যাস সমালোচনার ভাষায় বলা হয় উপকাহিনী বা sub plot. একটা উপন্যাসে এর দরকার হয় আরো নানা রকম কারণেঙ্গ সেগুলি এবার জেনে নিনঙ্গ

৩৭.৪.১ উপকাহিনীর অন্যান্য উপযোগিতা

যেকোন উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের যে একটা নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকে, সে বিষয়ে আপনাদের সে। আলোচনা হয়েছেঙ্গ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিজের বিশিষ্ট মানসিকতার জন্যই এই জীবনদৃষ্টি তৈরি হয়ঙ্গ উপন্যাস যদি এই জীবনদৃষ্টি বা লেখকের নিজস্ব কোন বক্তব্য আমরা খুঁজে না পাই তাহলে উপন্যাসটিকে সার্থক উপন্যাস হিসাবে মেনে নিতে পারবো নাঙ্গ এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা বা বক্তব্য, সেটা তো ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের মূল কাহিনী দিয়েই প্রকাশ করবেনঙ্গ কিন্তু এখন মনে হতে পারে যে সেই বক্তব্যকে আরো জোরদার করার জন্য তাঁর মনে হল, আরো দুটো একটা উপকাহিনী হলে বেশ সুবিধে হয়ঙ্গ তখন তিনি এই রকম গৌণ কাহিনীর কথা ভাবেনঙ্গ ব্যাপারটা আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারবেন আর একটু বুঝিয়ে বললেঙ্গ

প্রথম যে দুটি কারণের কথা বলেছি, উকাহিনী সে জন্য তো দরকার হয় নিশ্চয়ই—উপন্যাসের আয়তন বাড়াবার জন্য উপকাহিনীর খোঁজ করেন লেখক, পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখার জন্যও একসে। দু-তিনটি

ছোটবড় কাহিনী পেয়ে গেলে একবার এটা, একবার ওটা করে পাঠককে অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়, কিন্তু ওই জীবনদৃষ্টির ব্যাপারটা আরো গুরুত্বপূর্ণঙ্গ সেটার ব্যাপারে উপকাহিনীকে দুভাবে কাজে লাগান হয়ঙ্গ প্রথমত ধরুণ যে বিশেষ বক্তব্য ঔপন্যাসিক সেই উপন্যাসে প্রকাশ করতে চান ঠিক সেইরকম বক্তব্য নিয়েই যদি একটি ছোট কাহিনী পাশাপাশি বুনে যান, তাহলে তাঁর বক্তব্য আরো জোরদার হতে পারেঙ্গ দ্বিতীয় ব্যাপারটাও বেশ আকর্ষণীয়ঙ্গ মূল কাহিনীতে যেরকম জীবনচিত্র আছে ঠিক তার বিপরীত ধরনের একটা জীবনচিত্র যদি তিনি উপকাহিনীতে আঁকেন তাহলে প্রেক্ষিতের একটা বৈপরীত্য থাকে বলেই ঔপন্যাসকিের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কালো কাপড়ের ওপরে যেমন ফুটে ওঠে সাদা সুতোর কাজঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটা আপনাদের অনেকেরই চেনা, সেই জন্য ওই উপন্যাসকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে বেছে নিচ্ছিঙ্গ উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ পরম সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখী থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পেরে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেনঙ্গ এর ফল অবশ্য হল বিষময়, কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করল, এই হচ্ছে উপন্যাসের মূল কাহিনীঙ্গ এর সে। উপকাহিনী আছে দুটি—দেবেন্দ্রনাথ হীরার আখ্যান এবং শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির আখ্যানঙ্গ প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারলে তার বিষময় ফলে সংসারে বিপর্যয় দেখা যায়, এই মূল বক্তব্যের সমান্তরাল উপকাহিনী দেবেন্দ্র-হীরার আখ্যান—সেখানেও অসংযমী দেবেন্দ্র দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং হীরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলঙ্গ দ্বিতীয় রকমের যে ব্যাপারটা উপকাহিনীতে হয়ে থাকে, আমরা বলেছি, তার দৃষ্টান্ত শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি বৃত্তান্তঙ্গ নগেন্দ্রের অশান্তির সংসার আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য তাঁর বোন কলমমণির দাম্পত্যচিত্র এত মধুর করে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্রঙ্গ এমনকী, সংসারে প্রকৃত টান যে তৈরি হয় সন্তানকে দিয়ে এবং সেইখানেই যে নগেন্দ্রের জীবনে একটা মস্ত ফাক রয়ে গিয়েছে তা বোঝান হয়েছে কলমমণির সন্তান সতীশচন্দ্রের অত্যধিক পাকামি দিয়েঙ্গ

৩৭.৪.২ 'কপালকুণ্ডলার'র উপকাহিনী

উপকাহিনী লিখবার প্রথম যে কারণদুটি থকে, 'কপালকুণ্ডলা'র ক্ষেত্রে সে কারণদুটি যে ছিলই, সে কথা আপনারা আগেই শুনেছেন, কারণ 'উপকাহিনীর দরকার হয় কেন' শিরোনামে সে আলোচনা আমরা করেছিঙ্গ 'উপন্যাসের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে প্রাথমিকভাবে কিছুটা কলেবর বৃদ্ধির জন্যই উপকাহিনী লিখবর কথা ভাবতে হয়েছিলঙ্গ দ্বিতীয়ত নবকুমারের প্রথমা পত্নী মতিবিবিকে নিয়ে আসায় পাঠকের কৌতূহলও যে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, সে কথা অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেইঙ্গ এবার আমাদের দেখতে হবে উপকাহিনী সৃষ্টির অন্য দুটি তাৎপর্য এখানে ফুটিয়ে তুলবার কোন চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল কিনাঙ্গ

প্রথমেই অবশ্য আপনাদের জেনে রাখা ভাল যে, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবির গল্পটা প্রধান উপকাহিনী হলেও এখানে ছোটো আর একটি উপকাহিনী কিন্তু ছিল, সেটা শ্যামাসুন্দরীর গল্পঙ্গ এই গল্পটা যে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শোনাবেন, সে কথা নবকুমার পরিবারের পরিচয় দেবার সময়ই বঙ্কিম বলেছেনঙ্গ জায়গাটা আপনাদের একবার পড়ে শুনিয়ে দিতে পারি ঃ

'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিলঙ্গ জ্যেষ্ঠা বিধবা; তাহার

সহিত পাঠকমহাশয়ের পরিচয় হইবে নাঙ্গ দ্বিতীয় শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেননা, তিনি কুলীনপত্নীঙ্গ তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেনঙ্গ'

এবার ভাবুন উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব যে জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে সেটার কথাঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ধারণা, সমাজ-সংসারের বাইরে কোন মেয়ে যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বড় হয়ে ওঠে, তাহলে যৌবনকালে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলেও দাম্পত্যজীবনে সে সুখী হতে পারবেনাঙ্গ এই ধারণা তাঁর ছিল বলেই নবকুমারের প্রগাঢ় প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল—নবকুমারের প্রেম বা দাম্পত্যবন্ধন, কোনটাই তাকে আকর্ষণ করতে পারল নাঙ্গ

উপকাহিনীর কাজ হতে পারে এর অসম্ভব ধারার কোন কাহিনী সৃষ্টি করাঙ্গ সেটা যে সম্ভব ছিল না, সে কথা আমরা বুঝতে পারি, কারণ এই কাহিনী এতই বিচিত্র ধরণের যে একই গ্রন্থে এরকম আর একটি উপকাহিনী আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতো না নিশ্চয়ইঙ্গ সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র উপকাহিনীর অন্য তাৎপর্যটির কথা মনে রেখেছেন, অর্থাৎ বিপরীত ধরনের কাহিনী শুনিয়ে একটা বৈপরীত্য তৈরি করা, যাতে সেই প্রেক্ষিতে মূল কাহিনী বেশ ফুটে ওঠেঙ্গ ছোটো এবং বড়ো দুটি উপকাহিনীর কথাই মনে করুন, ব্যাপারটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবেঙ্গ

প্রথমে শ্যামাসুন্দরীর গল্পে দেখুন, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রীর মধ্যে সে এক জন বলে তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা বিশেষ নেইঙ্গ স্বামীর মন যাতে পাওয়া যায় সেজন্য প্রসাধনকলা, গুণপনার পরিচয় দেওয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে সে যথেষ্টই করেছে নিশ্চয়ই, তারপরও যখন স্বামীর মন পাওয়া যায়নি তখন টোটকার সাহায্য নিয়েচেঙ্গ কপালকুণ্ডলাকে বন থেকে ওষধি লতা খুঁজে আনতে বলেছেঙ্গ শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর মন পাবার এই তীব্র চেষ্টা, দাম্পত্যজীবনের প্রতি এই ভালবাসা কপালকুণ্ডলার উদাসীনতা এবং সংসারের প্রতি বিরাগকেই আরো স্পষ্ট করে নাকিঙ্গ

দ্বিতীয় গল্পে দেখুন এই বৈপরীত্য আরো তীব্রঙ্গ কপালকুণ্ডলা স্বামীর প্রেম পেয়েও তার মূল্য বুঝতে পারছে না, অথচ মতিবিবি জীবনে প্রচুর বৈভব, প্রচুর আভিজাত্য এবং বিলাস পেয়েও স্বামীপ্রেমের জন্য লালায়িতঙ্গ সেলিমের মোহ ত্যাগ করে সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে সে, কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, কাপালিকের কাজে সাহায্য করেছেঙ্গ কেন? উত্তর কিন্তু একটাই—নবকুমার তার স্বামী, সেই অধিকার সে আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, আবার দাম্পত্যজীবনে সে ফিরে আসবেঙ্গ মতিবিবির এই তীব্র জীবন পিপাসার প্রেক্ষিত কপালকুণ্ডলার সংসারজীবনে বিতৃষ্ণাকেই আরো স্পষ্ট করেছেঙ্গ উপকাহিনী দুটি এই জন্যই সার্থকঙ্গ

৩৭.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

কপালকুণ্ডলার কাহিনী সংক্রান্ত যেটুকু এতক্ষণ আলোচনা করা হল সেটা সংক্ষেপে একটু মনে করার চেষ্টা করুনঙ্গ

প্রথমে কাহিনীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন, মেদিনীপুরে গিয়ে একটি কাপালিককে দেখেই হোক বা যে কারণেই হোক, একটা প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জেগেছিল, কোন মেয়ে যদি জ্ঞান থেকেই সমাজ সংসারের বাইরে থাকে, তারপর যৌবনকালে তাকে কেউ সংসারী করার চেষ্টা করে, সংসারের প্রতি আগ্রহ কি তার জন্মাবে! সকলের সে। আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়েই বোধ হয় উপন্যাসটি তিনি লেখেনঙ্গ এর কাহিনীতে আমরা দেখি মৃণ্ময়ী প্রায় আজন্ম কাপালিকের কাছে নির্জন বালিয়াড়িতে বড়ো হয়েছেঙ্গ পরে

নবকুমারকে বিবাহ কর সংসারী হবার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছেঙ্গ

এই মূল কাহিনী সে। বঙ্কিমচন্দ্র আরো দুটি খণ্ডকাহিনী জুড়েছেন, উপন্যাসের আলোচনায় যাদের বলে উপকাহিনীঙ্গ উপন্যাসে উপকাহিনী দরকার হয় মূলত চারটি কারণে—উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করবার জন্য, পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখবার জন্য, লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির অনুরূপ একটি খণ্ডকাহিনী দিয়ে তার তীব্রতা বাড়াবার জন্য অথবা বিপরীত ধরনের উপকাহিনী তৈরি করে মূল কাহিনীর ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্যঙ্গ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী আছে, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী মতিবিবির গল্প এবং নবকুমারের বোন শ্যামসুন্দরীর গল্পঙ্গ এই উপকাহিনী দুটি উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছেঙ্গ পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্য জীবনের তৃষ্ণায় কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছেঙ্গ

৩৭.৫ 'কপালকুণ্ডলা'র বৃত্তগঠন

বৃত্তগঠন কথাটা ইংরেজি Plot-construction কথাটির বাংলা রূপান্তরঙ্গ উপন্যাসের story বা কাহিনী আর plot বা বৃত্ত ব্যাপার দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছেঙ্গ এই তফাতটা ই. এম. ফরস্টার নামে এক ইংরেজ ঔপন্যাসিক সমালোচক ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন Aspects of the Novel নামে একটি ছোটো বইয়েঙ্গ এইরকম একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিয়েই পার্থক্যটা বুঝিয়েছেন, বলেছেন—'রাজা মারা গেলেন, তারপর রাণি মারা গেলেন, এই হল কাহিনী, এবং 'রাজা মারা গেলেন, তারপর দুঃখে রাণিও মারা গেলেন', এই হল বৃত্তঙ্গ মানেটা কী হল? গল্পে আছে কেবল এই প্রশ্ন, তারপর কী হল! বৃত্তে আছে একটা কার্যকারণ শৃঙ্খলঙ্গ ব্যাপারটা আপনাদের আর একটু স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করিঙ্গ

যেকোন একটা ছোট গল্প বা উপন্যাস লিখতে গেলে তার গল্পটা তো লেখককে মোটামুটি ভাবে আগেই ভেবে নিতে হবে, কিন্তু সেটা ঠিক কীভাবে সাজিয়ে লিখলে পাঠকের কৌতূহল বজায় থাকবে, কার্যকারণ শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে, গোটা কাহিনীটার মধ্যে একটা বাঁধুনি থাকবে—এক কথায় তার বিন্যাসটাকেই বলে বৃত্তঙ্গ আপনারা যে আগে উপকাহিনীর কথা জেনেছেন, সেও কিন্তু এই বিন্যাসেরই ব্যাপারঙ্গ কীভাবে আমি আমার গল্পটাকে বিন্যস্ত করবো, এটা ভাবতে গিয়েই ঠিক করতে হয় এতে একটাই কাহিনী থাকবে; নাকি একের বেশিঙ্গ একটিই কাহিনী থাকলে সে বৃত্তকে আমরা বলি সরল বৃত্তঙ্গ যদি একাধিক উপকাহিনী থাকে, মানে আমাদের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মত, তবে সেই গঠনকে বলি জটিল বৃত্তঙ্গ আর যদি বেশ কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে কোনটিকেই ঠিক প্রধান মনে না হয়, সবগুলোই প্রথমটা দেখতে আলাদা বলে মনে হয়, তবে সেই গঠনটাকে বলি যৌগিক বৃত্ত, যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'ঙ্গ কপালকুণ্ডলার গঠনটা যে জটিল বৃত্তের, সেটা আমরা এর মধ্যেই জেনে ফেলেছি, কারণ এখানে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের গল্পটাই প্রধান, মতিবিবি আর শ্যামাসুন্দরীর গল্প এই প্রধান কাহিনীটাকে নিটোল হতে সাহায্য করেছে মাত্রঙ্গ এবার দেখি, গোটা কাহিনীটার বিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কেমনভাবে করেছেনঙ্গ

আকারে কপালকুণ্ডলা খুব বড় না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে বিন্যস্ত করেছেন চার খণ্ডেঙ্গ প্রত্যেক খণ্ডে অবশ্য বেশ কিছু করে পরিচ্ছেদ আছেঙ্গ প্রথম খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদে আছে—কাপালিকের আস্তানায় নবকুমারের গিয়ে পড়া, বন্দী হওয়া, কপালকুণ্ডলার সাহায্যে সাময়িক মুক্তি, অধিকারীর পৌরোহিত্যে তাদের বিবাহ এবং মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের নির্বিঘ্নে এগিয়ে দিয়ে আসাঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডের ছ-টি পরিচ্ছেদে পাই—

সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন, পথে নবকুমারের প্রথমা পত্নীর সং। দেখা এবং বিনা বাধায় কপালকুণ্ডলা নবকুমারের স্ত্রী হিসাবে গৃহীতঙ্গ তৃতীয় খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদেই পাই—মতিবিবির সংবাদ—আগ্রায় তার প্রতিপত্তির ইতিহাস এবং সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তনঙ্গ চতুর্থ খণ্ডের ন'টি পরিচ্ছেদে নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ, কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে চূড়ান্তষড়যন্ত্র এবং পরিণতিতে দুজনের মৃত্যুর আশঙ্কাঙ্গ ঠিক মতো কার্যকারণে শৃঙ্খলে সমস্ত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে কিনা বুঝতে গেলে অবশ্য আর একটু বিস্তারিত ভাবে গোটা ব্যাপারটা আমাদের জানতে হবেঙ্গ প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে নবকুমারের নির্বাসনের কাজটা সম্পন্ন হয়েছেঙ্গ দিগভ্রান্ত যাত্রীনৌকা কোনক্রমে চড়ায় বেঁধে রান্নার উদ্যোগ করলে তা নষ্ট হতে বসেছিল চেলাকাঠের অভাবেঙ্গ অন্য কেউ রাজি না হওয়ার নবকুমার একাই গিয়েছিল কাঠ কাটতে, ফলে জোয়ার আসবার সময় নবকুমারের প্রতীক্ষা আর কেউ করতে পারে নিঙ্গ এই প্রসং। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আমাদের একটা উপদেশ দিয়েছিলেন সেটিও আপনাদের মনে রাখতে হবে ঃ

'ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদঙ্গ . . . তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তর না হইব কেন?

একেবারে পরের পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সং। সাক্ষাৎ হয়ে গেলে গল্পের কোন চমক থাকে না, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিঃস। ও অসহায় নবকুমারের এমন কষ্ট দেখান হয়েছে যাতে যে কোন কারও সন্ধান পেলে সে বেঁচে যায়ঙ্গ চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সন্ধান পেয়েছে এবং তাতে সে আশঙ্কিত না হয়ে খুশিই হয়েছেঙ্গ পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সং। পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে—পথভোলা পথিককে সে কাপালিকের আশ্রয়ে যেমন পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমারকে বলিদানের জন্য কাপালিক বন্ধন করলে বাঁধনও কেটে দিয়েছে সেঙ্গ সপ্তম পরিচ্ছেদে খুব যুক্তিসংগত ভাবেই কাপালিককে উঁচু বালিয়াড়ি থেকে পড়ে যেতে দেখিয়েছেন লেখক, যাতে কিছুদিনের জন্য সে কর্মক্ষয় না থাকে, কারণ অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী নবকুমারকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন এবং নবম পরিচ্ছেদে বিবাহের পর তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন—গোটা ব্যাপারটাই সময় সাপেক্ষঙ্গ যেহেতু দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবিকে দেখানো হবে, প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদেই তার উল্লেখ করা হয়েছেঙ্গ

নবকুমারের সং। মতিবিবির সাক্ষাৎ করানো হবে বলেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার পালকির সং। না গিয়ে নবকুমারকে পদব্রজে যাত্রা করানো হয়েছে, মতিবিবি দস্যুর হাতে নিগৃহীতা হয়েছে এবং নবকুমারের সাহায্যে সরাইখানায় পৌঁচেছেঙ্গ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি তার স্বামীকে চিনেছে, নবকুমার তাকে চেনেনিঙ্গ সপত্নীকে দেখার প্রলোভন অবশ্যই এবার জাগবে, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলাকে দেখেছে মতিবিবি, তাকে গহনা দান করে নিজের বৈভব বোঝাতে চেয়েছেঙ্গ পরের পরিচ্ছেদেই সেগুলি ভিখারীকে দান করে কপালকুণ্ডলা তার নিজের চরিত্রও বুঝিয়ে দিয়েছেঙ্গ যুক্তি অনুসারে এরপর থাকা উচিত একটি অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে নবকুমারের পরিবার কীভাবে গ্রহণ করেঙ্গ পঞ্চম পরিচ্ছেদে সেটাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন কপালকুণ্ডলার প্রেমে নবকুমার বিহ্বল হলেও কপালকুণ্ডলার কোনরকম পরিবর্তন নেইঙ্গ

যে কোনো অল্প শক্তিমান লেখক হলে কাহিনী হয় এখানেই শেষ হতো, অথবা কপালকুণ্ডলা যে কিছুতেই সংসারে মন বসাতে পারছেনা, বার বার তার বর্ণনা দিয়ে আমাদের বিরক্ত করা হতোঙ্গ এই একঘেয়েমি এড়াবার জন্য, অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে সংসারে মন বসাবার জন্য বেশ কিছুটা সময় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গোটা

দ্বিতীয়খণ্ডই প্রায় অতিবাহিত করেছেন নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী ও আগ্রার সম্রাট পরিবার নিয়েঙ্গ প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন সম্রাট সেলিমের অত্যন্ত কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে উড়িষ্যা পালাতে হয়েছিল, যাতে মেদিনীপুরে নবকুমারের সং। তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়ঙ্গ সেই পূর্বসূত্র অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের লড়াই দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেঙ্গ আগ্রার সিংহাসনে মতিবিবির টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে সে গিয়েছে শের আফগানের বেগম মেহেরউন্নিসার কাছেঙ্গ নিজের অস্তিত্বরক্ষা প্রায় অসম্ভব, সে বুঝে গিয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে সম্রাট সেলিমের সং। কথা বলেঙ্গ সুতরাং পঞ্চম পরিচ্ছেদে অনিবার্য ভাবেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আগ্রা ত্যাগেরঙ্গ এইবার আশাহত, ক্ষমতাচ্যুত, ভাগ্যের লড়াইয়ে পরাজিত মতিবিবির মনে ঝলসে উঠবে প্রতিহিংসার আগুন, এটাই স্বাভাবিক—তার অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করেছে, তার স্বামীকে যে পরিত্বে বরণ করেছে, তাকে সরতে হবে সেখান থেকে, অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে মতিবিবিরঙ্গ সুতরাং পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে মতিবিবি ফিরে এসেছে পদ্মবতী হয়ে, গাঁটছড়া বেঁধেছে কাপালিকের সং।, কপালকুণ্ডলার সং।ঙ্গ

নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত, চতুর্থখণ্ডে সেই কাজটিই তিনি করেছেনঙ্গ কপালকুণ্ডলার চরিত্র অপরিবর্তিত, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর বনে সে ওষধি খুঁজতে গিয়েছেঙ্গ এ কাজ তাকে দ্বিতীয়বার করতে হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, তখনই কাপালিককে জ।লে সে দেখতে পেয়েছে, ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতী এবং কাপালিকের পরামর্শও সে শুনতে পেয়েছেঙ্গ তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার নিয়তি যেন সে দেখতে পেয়েছে স্বপ্নে, সুতরাং আর একবার সাক্ষাৎ করার জন্য পদ্মবতীর পত্র পেয়ে সে জ।লে যাবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেঙ্গ নাটকীয়তার চূড়ান্ত পর্যায় পত্র হারানো ও নবকুমারের তা হস্তগত হওয়াঙ্গ এবার ক্ষিপ্ত নবকুমার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাপালিককে তার বাড়িতে ডেকে আনতেও দ্বিধা বোধ করে নাঙ্গ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং মদ্যপান করিয়ে কাপালিক নবকুমারকে এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে যে সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতীর সং। কপালকুণ্ডলার অ ুরীয় বিনিময় দেখতে পেয়ে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দ্বিচারিণী ভাবেঙ্গ অষ্টম পরিচ্ছেদে নবকুমারই কপালকুণ্ডলাকে ধরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, অদৃষ্টের পরিহাস বোধ হয় একেই বলেঙ্গ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকুমারের পরিচয় কপালকুণ্ডলার মুখে শুনে তার ঘোর কাটেঙ্গ কিন্তু নদীর পাড় ভেঙে কপালকুণ্ডলা জলে পড়ে যায়, উদ্ধার করার জন্য নবকুমারও ঝাঁপ দেয়ঙ্গ কেউই আর উঠতে পারে নাঙ্গ

প্রান্তলিপি

[৩]'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তার সার কথাটি আপনারা জেনে রাখতে পারেনঙ্গ তিনি বলেছেন 'যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিতঙ্গ'

কাহিনীর এই বিনাস থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী নিপুণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাগুলি সজ্জিত করেছেন, সর্বত্র একটা যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে চলেছেন এবং নিতান্ত প্রয়োজনেই মতিবিবির উপকাহিনী সৃষ্টি করেছেনঙ্গ

৩৭.৬ 'কপালকুণ্ডলা'র অতিপ্রাকৃত উপাদান

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা হয়েছে, এবং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণই যখন বাস্তবতা, তখন বাস্তব উপাদান বা প্রকৃত উপাদানই তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিকঙ্গ কিন্তু আপনারা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস পড়ে থাকেন, তবে একথা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল যেমন স্বপ্নদর্শন, অলৌকিক ঘটনা, ভাগ্যগণনা প্রভৃতিঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অবশ্য মনে করতেন পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য বা বাইরের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবার জন্যই এসব ঘটনা উপন্যাসে এসে পড়েছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে ভবিষ্যৎ এবং পরিণতি নির্দেশের কাজেও এইসব ঘটনা অনেক সময়ই কাজে লেগেছেঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এইরকম দৈব বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছে মূলত দুবার—একবার প্রথম অঙ্কের নবম পরিচ্ছেদে, অন্যবার চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় পরিচ্ছেদেঙ্গ এর কাহিনী আপনারা জানেন, কাজেই ঘটনাদুটির উল্লেখ করলেই আপনারা বুঝতে পারবেনঙ্গ

নবকুমারকে উদ্ধার করে প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে যখন কপালকুণ্ডলা অধিকারীর কাছে এসেছিল তখন অধিকারী তার সঙ্গে। নবকুমারের বিবাহ দেবার সংকল্প করে 'একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেনঙ্গ' বিল্বপত্রটি পড়ে নি বলেই তিনি মনে করেছিলেন—এই সংকল্পে দেবী কালিকার সম্মতি আছেঙ্গ কিন্তু বিবাহের পর যাত্রাকালে যখন দেবীর কাছে আবার এসেছেন—'ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেনঙ্গ পত্রটি পড়িয়া গেলঙ্গ'

এই ঘটনা কপালকুণ্ডলার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, এমন হতে পারে, কারণ সংস্কার এবং তামসিক ভক্তি তার মনে অত্যন্ত বেশি থাকারই কথাঙ্গ

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা একটি স্বপ্ন দেখেছেঙ্গ স্বপ্নের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বলে কিছু থাকতে পারে নাঙ্গ কিন্তু এখানেও যেন তার ভবিষ্যতের একটি নির্দেশ আমরা পাইঙ্গ কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখেছে—একটি তরীতে বসন্তলীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছেঙ্গ হঠাৎ দুর্যোগের কালো মেঘে সব পরিপূর্ণ হয়ে গেলঙ্গ প্রচণ্ড তর। উঠল সমুদ্রেঙ্গ 'একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ' এসে তরী বাঁ হাতে তুলে ধরলঙ্গ 'ভীমকান্তশ্রীময়ী ব্রাহ্মণবেশধারী' অন্য একজন তরী ধরে জানতে চাইলেন—তরী ভাসাবেন না নিমগ্ন করবেনঙ্গ ''কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, 'নিমগ্ন করঙ্গ'' তরী পাতালে নিমজ্জিত হলঙ্গ

এই স্বপ্নের অবশ্য একটা সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা পাইঙ্গ কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন নষ্ট করার জন্যই যে কাপালিক এসেছে, তা কপালকুণ্ডলা দেখেছেঙ্গ ব্রাহ্মণবেশধারী যে পুরুষ নয়, তা সে শুনেছে, কিন্তু কাপালিকের সঙ্গে। তাকে মন্ত্রণা করতে যখন সে দেখেছে তখন তার সর্বনাশের জন্যই জল্পনা-কল্পনা চলেছে, এ কথা চিন্তা করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়ঙ্গ স্বপ্নটি হয়তো তার সেই চিন্তারই ফলমাত্রঙ্গ

৩৭.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

আমাদের এতক্ষণকার আলোচনায় এ কথা নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, কপালকুণ্ডলায় লেখক এমন

‘একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, ঠিক যেরকম পরিবেশ আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আমরা পাই নাঙ্গ এটা ঠিক আমাদের চেনা মানুষের গল্পও নয়—কাপালিক আর কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ আমরা কেউই প্রায় পাবো নাঙ্গ যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তাও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, কারণ ওইভাবে একটি নির্জন বালিয়াড়িতে নির্বাসিত হবো এবং একটি সুন্দরী যুবতী কাছে এসে বলবে ‘পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?’ এমন অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই হয়তো হবে নাঙ্গ

প্রান্তলিপি

এখানে একবার মনে করে নিতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’-র আরম্ভটা ঃ ‘৯৯৭ ব াব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেনঙ্গ’

ব্যাপারটা যতই কাল্পনিক হোক, এই কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে তাকে বাস্তব করে তুলতে হবে, অর্থাৎ পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবেঙ্গ সেই ব্যাপারটা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী কী চেষ্টা করেছেন,—সেগুলোই আমরা এবার লক্ষ করার চেষ্টা করবোঙ্গ

৩৭.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

যে গল্প শোনানো হচ্ছে, সেটা আরম্ভ করবার সময়টা একেবারে নির্দিস্ট করে বললে কী হয়, মনে হয় যেন এটা গল্প নয়,—সত্য ঘটনাঙ্গ তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস শুরু করেছেন এইভাবে ঃ

‘প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গ াসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলঙ্গ’ অর্থাৎ তখন সালটা যে প্রায় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ—কারণ এই উপন্যাস লেখা হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, এটা স্পষ্ট করে বলা হলঙ্গ তাতে মনে হল, যেন এটা কোন কাল্পনিক কাহিনী নয়ঙ্গ অবশ্য এটা বঙ্কিমচন্দ্রের অতি প্রিয় কৌশল, অন্যান্য উপন্যাসেও এরকম কৌশল আপনি পাবেনঙ্গ

কিন্তু এই কৌশলের কথা মুখে বলা যত সহজ, সর্বদা স্মরণ রেখে ঠিক সেইমত উপন্যাস লিখে যাওয়া কিন্তু অতো সহজ নয়ঙ্গ যেমন দেখুন, সপ্তদশ শতকের ঘটনাক্রম বললেই মনে রাখতে হবে, ইংরেজ তখনও এদেশে আসেনিঙ্গ সেটা মাথায় রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ‘পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিলঙ্গ’

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র যখন মতিবিবির প্রস। আগ্রার মোগল রাজবংশের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনও স্মরণ রেখেছেন, সেটা সম্রাট আকবরের মৃত্যু ও যুবরাজ সেলিমের সিংহাসন লাভের সময়ঙ্গ

তৃতীয় আর একটি প্রস। এখানে উল্লেখ করা যায়ঙ্গ সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাসভবনের কাছাকাছি এমন অরণ্য থাকতে হবে যেখানে কাপালিক লুগিয়ে থাকতে পারে, যেখানে ওষধির সন্ধানে কপালকুণ্ডলা পরিভ্রমণ করতে পারেঙ্গ এই কারণেই সমৃদ্ধিশালী নগর হিসাবে পরিচিত সপ্তগ্রামের সে সময় কীরকম অবস্থা ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন একটু বিশেষভাবে ঃ

‘সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওপনিবেশিক ভাগে নবকুমারের বাসঙ্গ . . . নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বনঙ্গ বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর

বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলঙ্গ

বাস্তবতা রক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সতর্কতা এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোধ হয় সৃষ্ট হতে পারবেঙ্গ

৩৭.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনী

একটি কাল্পনিক কাহিনী পরিবেষণ করতে গিয়ে উপকাহিনীতে অর্থাৎ নবকুমারের প্রথমা পত্নীর গল্প-প্রসে। ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আশ্রয় করলেন, এ বিষয়ে নানা কারণ অনুমান করা যায়ঙ্গ কেউ কেউ এরকম বলেন যে—'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবেশে এবং ঐতিহাসিক চরিত্র সমন্বয়ে রচনা করে তিনি বিশেষ সাফল্য ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, সেই জন্যই দ্বিতীয় উপন্যাসে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি, ইতিহাসের কাহিনী যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেটুকুই বর্ণনা করেছেনঙ্গ

আমার কিন্তু সে কথা মনে হয় নাঙ্গ এ বিষয়ে আমার মত হল এই যে, বাস্তবতা রক্ষার জন্যই এ কাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে করতে হয়েছেঙ্গ এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবেই আমারঙ্গ আপনারা উপন্যাসটি ভালভাবে পড়ে দেখে যদি এর সে। একমত না হন তবে অবশ্যই অন্যভাবে আপনার শিক্ষাসহায়কের সে। আলোচনা করবেনঙ্গ আমি মনে করি যে কাহিনী এই উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু কাল্পনিক নয়, এত বিচিত্র ধরনের যে, কোন মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাকে ধরার সম্ভাবনা খুবই কমঙ্গ এই রকম একটা পুরোপুরি কাল্পনিক কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে বিশ্বাসের একটা ভূমি দরকার, 'ইতিহাস সেই বিশ্বাসের ভূমি বলে আমি মনে করিঙ্গ রসুলপুরের নদীর চরে কাপালিকের বসবাস বা প্রায় আজন্ম কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করবার ব্যাপারটা একেবারে অলীক হতে পারে, কিন্তু সম্রাট জাহাীরের সিংহাসনলাভ তো অলীক নয়, মানসিংহের ভগিনী যে তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন, এ খবর তো অসত্য নয়, এবং জাহাীর যে শের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসার প্রতি গাঢ় প্রণয়াসক্ত ছিলেন, ইতিহাসই তার নির্ভুল সাক্ষ্য দেয়—অন্যায়ভাবে শের আফগানকে হত্যা পর্যন্ত করাতে হয়েছিল তাঁকে নিজের অভিলাস পূর্ণ করার জন্যঙ্গ কাজেই এমন একটি শক্ত জমির ওপর নিজের উপন্যাসকে দাঁড় করাবার যে সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র হাতে পেয়েছেন, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন নবকুমারের প্রথমা পত্নীকে লুৎফ-উন্নিসা হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন করিয়েঙ্গ ইতিহাসের এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলেই লুৎফ-উন্নিসার কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য এবং লুৎফ-উন্নিসার সূত্রেই নবকুমারের কাহিনীটি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেঙ্গ

৩৭.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

চারখণ্ডে সম্পূর্ণ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে পরিচ্ছেদের সংখ্যা একত্রিশঙ্গ প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছেনঙ্গ পরিচ্ছেদের ঘটনার সে। কিছুটা ভাবসাদৃশ্য আছে, বিভিন্ন সাহিত্য থেকে এরকম অংশ খুঁজে খুঁজে এক বা একাধিক পংক্তি পরিচ্ছেদ শুরুর আগে তুলে দিয়েছেনঙ্গ এতে শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাই নয়—যে সমস্ত নাটক ও কাব্যকে আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তাদের সে। ভাবসাদৃশ্যে উপন্যাসটিও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছেঙ্গ

উদ্ধৃতিগুলি আপনাদের কারো কারো কাছে অপরিচিত মনে হতেও পারেঙ্গ কিন্তু এগুলি না জানা থাকলে

উপন্যাসটির রস পুরোপুরি গ্রহণ করা যাবে না, তাই আমি অতি সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেবোঙ্গ

প্রথম খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ — 'Floating straight obedient to the stream.' বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের Comedy of Errors নাটকের একটি পংক্তিঙ্গ এই নাটক অবলম্বনেই বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'ঙ্গ নবকুমারের যাত্রীবাহী নৌকা যেমন এখানে ঘন কুয়াশার মধ্যে পড়ে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, শেক্সপীয়রের নাটকেও তেমনি বণিক Aegion (ইজিয়ন) দিগন্তজোড়া কুয়াশার মধ্যে পড়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেনঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — 'Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!'- শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক King Lear-এর প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে এটি নেওয়া হয়েছেঙ্গ বড়ো এবং মেজো মেয়েকে সম্রাট লিয়র অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই পাননি বলে এটি তাঁর খেদোক্তি—অকৃতজ্ঞতাই সবচেয়ে কঠিন হৃদয় শত্রুঙ্গ কপালকুণ্ডলার এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও এইরকম অকৃতজ্ঞতাই পেয়েছিল সহযাত্রীদের কাছেঙ্গ তাদের আহার হবে না বলে গিয়েছিল কাঠের জোগাড় করতে, তারাই তাকে চরে নির্বাসন দিয়ে চলে গিয়েছিলঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— '— Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And girmly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes.'

বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' (Don Juan) কাব্যগ্রন্থ থেকে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছেঙ্গ এই কাব্যের নায়ক জাহাজে করে সমুদ্রপথে যখন চলেছিল, তখন রাত্রির গভীর অন্ধকার নেমে আসার সে। সে। এরকম অনুভূতিই তার হয়েছিল, যেন যবনিকা উন্মোচিত হওয়ার সে। এসেছে নিকষ কালো রাত সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ ও দৃষ্টি হতাশ করে দিতেঙ্গ ডন জুয়ানের সে। অবশ্য একজন সিনী ছিল, কপালকুণ্ডলার এই পরিচ্ছেদে অজানা নির্জন দ্বীপের কালো অন্ধকারে নবকুমার একাঙ্গ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তিঙ্গ'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের পঞ্চম সর্গে এই পংক্তি দুটি আছেঙ্গ লঙ্কার উত্তর দরজায় গভীর বনের মধ্যে অবস্থিত চণ্ডীদেবীর মন্দিরে লক্ষ্মণ এসেছিলেন দেবীকে পুজো করতে, উদ্দেশ্য মেঘনাদকে বধ করাঙ্গ সেই সময়ই দরজায় ভীষণদর্শন মহাদেবকে দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেনঙ্গ নবকুমার এই পরিচ্ছেদে কাপালিককে ওইভাবে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বোধ হয়ঙ্গ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— '—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তেঙ্গ
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ঙ্গঙ্গ'

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য 'রঘুবংশম্'-এর ষোড়শ সর্গে এই শ্লোকটি আছেঙ্গ রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর শারাবতীতে যখন কুশ রাজত্ব করছেন, গভীর রাতে একদিন অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সাধারণ নারী হিসাবে তাঁর বন্ধ ঘরে তাঁকে দর্শন দিলেনঙ্গ সেই রাজলক্ষ্মীকেই কথাগুলি কুশ বলেছিলেন—আপনার বিশেষ যোগশক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ আপনার আকৃতি দুখিনী নারীর মত, আপনাকে হিমক্লান্ত মৃণালিনী বা পদ্মফুলের মত মনে হচ্ছেঙ্গ নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখে হতবাক হয়ে যাবে বলেই এই পরিচ্ছেদে 'রঘুবংশের' কুশের বিমূঢ় অবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়েছেঙ্গ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'কথং নিগড়সংযতাসিঙ্গ দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—

শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে রাজার এই সংলাপের অংশ সংগ্রহ করা হয়েছেঙ্গ শৃঙ্খলিতা সাগরিকাকে দেখে রাজা এই কথা বলেছেন—এ কী! তুমি শৃঙ্খলে আবদ্ধঙ্গ আমি দ্রুত এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাবঙ্গ কপালকুণ্ডলাও এই পরিচ্ছেদে নবকুমারের বন্ধনমুক্ত ঘটাবে, সেই জন্যই এই প্রস। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেনঙ্গ

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak.'

এই অংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি বোঝা যায়ঙ্গ এটি নেওয়া হয়েছে মেকলের Lays of Ancient Rome গ্রন্থ থেকেঙ্গ শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে লুনার অধিপতি ভূপতিত হওয়ার স। মেকলে তুলনা করেছিলেন অ্যালভার্নাস পাহাড়ের একটি বজ্রাহত ওক গাছের লুটিয়ে পড়ার স।ঙ্গ এখানে বালিয়াড়ির শিখর থেকে কাপালিকের পতন প্রস। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই তুলনার কথা মনে পড়ে গিয়েছেঙ্গ

অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua.'

এটি শেক্সপীয়রের 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' (Romes and Juliet) নাটকের অংশবিশেষ (4th Act, Scene1)ঙ্গ এখানে নায়িকা জুলিয়েটকে লরেন্স সান্ত্বনা দিয়ে বলছে,—ওষুধের প্রভাবে মৃতপ্রায় জুলিয়েটকে কবরস্থ করার জন্য নিয়ে এলে সেই রাত্রেই রোমিও তাকে মান্টুয়ায় নিয়ে যাবেঙ্গ মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছে বলেই এই অংশ লেখকের মনে পড়েছেঙ্গ

নবম পরিচ্ছেদ— 'কণ্বঙ্গ অলং বুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়ঙ্গ'

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব এই করেছিলেনঙ্গ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় তাকে অঝোরে কাঁদতে দেখে তিনি বলেছিলেন, আর কেঁদো না, স্থির হওঙ্গ তোমার পথের দিকে চেয়ে দেখোঙ্গ নবম পরিচ্ছেদে অধিকারীও প্রায় সেই ভূমিকা গ্রহণ করে কপালকুণ্ডলাকে উপদেশ দিয়েছেন বলে সদৃশ অংশ লেখক উল্লেখ করেছেনঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— '—There—now lean on me:
Place your foot here—

ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' (Manfred) নাট্যকাব্যে এই সংলাপটি পাওয়া যায়ঙ্গ পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় ম্যানফ্রেডের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলে একজন শিকারী তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এ কথা বলেছিল—আমার দেহের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে আসুনঙ্গ এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও মতিবিবিকে সেইরকম কথা বলবে বলে লেখক ম্যানফ্রেডের ওই অংশের সে। নিজের লেখার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেনঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের সংস্কৃত 'উদ্ধবদূত' কাব্যে কবি শ্রীরাধাকে দেখে এই মন্তব্য করেন—স্বভাব চঞ্চলা এই নারীটি কে? 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার মতিবিবিকে চিনতে না পেরে কেবল প্রগলভা নারীটির আচরণ দেখে এইরকম কথাই হয়তো মনে করে থাকবেঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'ধর দেরি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণঙ্গ'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছেঙ্গ রতিদেবী এ কথা বলেছেন দেবী পার্বতীকেঙ্গ রাবণবধের জন্য মহাদেবের অনুগ্রহ দরকার, মহাদেব ধ্যানমগ্ন—সেই ধ্যান ভ। করতে পারেন একমাত্র পার্বতী, তাই রামচন্দ্রের অনুরোধে রতিদেবী পার্বতীকে মোহিনী সাজে সাজাবার জন্য এ কথা বলেছেনঙ্গ এই পরিচ্ছেদে মতিবিবিও কপালকুণ্ডলাকে সাজাবে, কিন্তু তার সে। মহাদেবের ধ্যানভ।ের সাদৃশ্য বোধহয় খুব বেশি নেইঙ্গ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চিঙ্গ'

এটিও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এখানেও আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার সব গহনা ভিক্ষুককে দেওয়ার সে। মধুসূদনের কাব্যের সাদৃশ্য খুব বেশি নেইঙ্গ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে সীতা রাবণ কর্তৃক হরণের সময় রামচন্দ্রকে পথের সন্ধান দেবার জন্য অলংকারগুলি ওইভাবে ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেনঙ্গ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎঙ্গ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎঙ্গঙ্গ'

কবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' পত্রকাব্যের উত্তরমেঘ অংশের ৪২-সংখ্যক শ্লোকের এটি আরম্ভঙ্গ এই শ্লোকে

নির্বাসিত যক্ষের প্রগাঢ় প্রেম স্পষ্ট হয়েছেঙ্গ এর বাংলা ভাষান্তর প্রায় এইরকম—তোমার সখীদের কাছেও সে কথা অনায়াসে প্রকাশ্যেই বলা যায়, সেরকম অগোপন কথাও একদিন সে তোমার আনন স্পর্শ করার লোভে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলতোঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই নবকুমারের প্রেমের গাঢ়তা বোঝাতেই এই সদৃশ বর্ণনা খুঁজেছেনঙ্গ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্ঙ্গ
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যুরুণায় কল্পতেঙ্গঙ্গ'

কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পঞ্চম সর্গে এই শ্লোকটি আছেঙ্গ উমার তপস্বিনী মূর্তি দেখে স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মচারী বেশে তাঁকে ছলনা করতে এসে এই কথা বলেছিলেন—যৌবনেই সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে তুমি বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী বল্কল ধারণ করেছো কেন! প্রদোষকালে প্রস্ফুট চন্দ্র ও তারকাশোভিত বিভাবরী কি কখনও অরুণের কাছে যেতে পারে, তুমিই বলো! অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে যোগিনী কপালকুণ্ডলা সে। সাধিকা উমার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেনঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— 'কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবংঙ্গ'

শ্রীহর্ষরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোকের সামান্য অংশ এখানে উদ্ধার করা হয়েছেঙ্গ কথাটা বলেছেন রাজমন্ত্রী যৌগন্ধাবায়ণঙ্গ রাজার ম।লের জন্যই অনেক রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে যা রাজার পছন্দ নয়ঙ্গ সেই জন্যই তিনি ভৃত্যের কাজকে বড়ই কষ্টকর বলেছেনঙ্গ এই পরিচ্ছেদে লুৎফ-উন্নিসাও অনেক রকমের অনভিপ্রেত কাজ করেছে, তবে তা নিজের ম।লের জন্য নয় রাজার ম।লের জন্য, বলা শক্তঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরেঙ্গ
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরেঙ্গঙ্গ
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হালঙ্গ
আজিকে বিফলা হলো, হতে পারে কালঙ্গঙ্গ

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটক থেকে এই অংশটি সংগ্রহ করা হয়েছেঙ্গ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত এই উক্তিটি করেছেন মন্ত্রী জলধরঙ্গ স্ত্রীর কাছে একবার অপদস্থ হয়ে আবার তারই সাহায্য প্রার্থনা করবেন সংকল্প করে তাঁর এই উক্তিঙ্গ এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরও হতোদ্যম না হয়ে সে নতুন করে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছে বলেই অংশটি প্রাসঙ্গিকঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথ মমাস্তিঙ্গ'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'উদ্ধবদূত' কাব্যগ্রন্থ থেকে এই পংক্তি উদ্ধৃতঙ্গ এই উক্তি শ্রীরাধার—শ্যাম ছাড়া আমার প্রাণনাথ আর কেউ নেইঙ্গ এই পরিচ্ছেদে সম্ভবত মতিবিবিও বুঝতে পেরেছে, নবকুমারের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন গতি তার নেইঙ্গ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারেঙ্গ'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরা।না কাব্য' থেকে সংগৃহীতঙ্গ এটি 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রের অন্তর্ভুক্তঙ্গ রাজা শান্তনুকে জাহ্নবী বিবাহ করেছিলেন কেবল এই শর্তে যে সন্তানকে তিনি গ।।গর্ভে-বিসর্জন দেবেন, রাজা বাধা দিলেই তিনি স্বর্গে ফিরে যাবেনঙ্গ যেবার অসহিষ্ণু হয়ে শান্তনু বাধা দেন সেবারই জাহ্নবী সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং রাজাকে এ কথা বলেনঙ্গ এই পরিচ্ছেদে সেলিমের প্রতি মতিবিবির সম্ভাষণ পড়লেই বোঝা যায়, তার বক্তব্যও এই একইঙ্গ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেলঙ্গ
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ ন গলেঙ্গঙ্গ
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেলঙ্গ
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেলঙ্গঙ্গ
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখঙ্গ
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল একঙ্গঙ্গ'

এটি কবি বিদ্যাপতির অতি বিখ্যাত এক বৈষ্ণব পদঙ্গ পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিতঙ্গ কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর রাধার বাবসম্মিলনের পদ এবং এখানে আর অংশ নয়, গোটা পদটাই বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দিয়েছেনঙ্গ কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ রাধা এখানে প্রেমের অসীম রহস্যময়তার অনুভূতিই প্রকাশ করেছেনঙ্গ এতদিন লীলায় অংশগ্রহণ করেও এ লীলা কত মুর রাধা বুঝতে পারেননি, লক্ষ লক্ষ যুগ কৃষ্ণের হৃদয়ে হৃদয় যোগ করেও হৃদয় জুড়োয় নিঙ্গ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মতিবিবি এই প্রথম বুঝতে পারছেন প্রকৃত প্রেমের রহস্য, তাই প্রেমের অসীম রহস্যময় অনুভূতির পদ এখানে সংযোজিত হয়েছেঙ্গ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়েঙ্গঙ্গ'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরা।না কাব্যে'র লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা' পত্রিকার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃতঙ্গ মধুসূদনের অমর লেখনীতে রাক্ষসীও এখানে প্রেমমুগ্ধা নারীতে পরিণত হয়েছে, বলেছে দেহ মনপ্রাণ সবই সে সমর্পণ করবে লক্ষ্মণকেঙ্গ শিরোনাম হিসাবে এটা অত্যন্ত উপযোগী বলেই আমাদের মনে হয়, কারণ রাক্ষসীর মতই ইন্দ্রিয় লালসাযুক্ত জীবনযাপন করে মতিবিবি এখন মধুর দাম্পত্যপ্রেমে আত্মসমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেঙ্গ

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat.'—

বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি 'ম্যাকবেথ' —নাটক থেকে অংশটি গৃহীতঙ্গ এটি প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যের অন্তর্ভুক্তঙ্গ রাজা ডানকানকে মারার ব্যাপারে প্রথমে ছিল তাঁর তীব্র অনিচ্ছা, এ ব্যাপারে সংকল্প যখন স্থির করেন, তখনই এই উক্তি তিনি করেনঙ্গ নবকুমারের কাছে আত্মসমর্পণ যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন মতিবিবি নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য কপালকুণ্ডলার সর্বনাশে উদ্যত হয়েছে—এই ব্যাপারটাই এখানে দেখতে পাবো বলে শীর্ষ উদ্ধৃতি সংগত বলেই আমাদের মনে হয়ঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— 'রাধিকার বেড়ী ভা।, এ মম মিনতিঙ্গ'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজা।না কাব্যে'র অন্তর্গত 'সারিকা' নামক একটি কবিতা থেকে এই পংক্তিটি উদ্ধার করা হয়েছেঙ্গ শ্রীরাধা পিঞ্জরে আবদ্ধ সারিকাকে দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেনঙ্গ তিনি যে সমাজ-সংসারের বাধা অতিক্রম করে কৃষ্ণের সে। মিলিত হতে পারছেন না, তার সে। সারিকার শুকের সে। মিলিত না হতে পারার যন্ত্রণাকে এক করে দেখতে পেয়েছেন বলেই তাঁর মিনতি সারিকাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং তার পরেই তাঁর নিজের বেড়ি ভাঙার জন্যঙ্গ মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কপালকুণ্ডলাকে সারিকার সমগোত্রীয় মনে করেছেনঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— '—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light.'

ইংরেজ কবি Keats-এর বিখ্যাত কবিতা Ode to A Nightingale থেকে এই অংশটুকু এখানে তুলে আনা হয়েছেঙ্গ কোমল রাত্রি, আকাশের সম্রাজ্ঞী চন্দ্রকলা প্রসন্না, তারাপরীর দল ঝাঁক বেঁধে ভিড় করেছে চারপাশে, অথচ কবির কাছেই কোন আলো নেইঙ্গ এই অংশের সে। প্রবল সাদৃশ্য আছে কপালকুণ্ডলার নিশাভিসারেরঙ্গ বাসন্তীরাত্রি জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, কিন্তু তার জীবনে তো নেমে আসবেই অসুন্দর অন্ধকারঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'I had a dream, which was not all a dream'.

লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' — কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে পংক্তিটি সংগ্রহ করা হয়েছেঙ্গ এই কাব্যের নায়িকা হেইডি একটা স্বপ্ন দেখেছিল, যা শুধু স্বপ্ন নয়, তার জীবনের পূর্বাভাসও বটেঙ্গ তাই বলা হয়েছে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়ঙ্গ কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের সে। এর একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে বলেই পংক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে এসেছেঙ্গ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '— I will have grounds
More relative than this.'

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক 'হ্যামেলেটের (Hamlet) প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে এটি সংগৃহীতঙ্গ একটি নাটকের অভিনয় করিয়ে হ্যামলেট পিতার হত্যাকারী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, সেই প্রস।ে হ্যামলেটের এই উক্তিঙ্গ কপালকুণ্ডলাও সমস্ত সংশয়ের অবসানের জন্যই ব্রাহ্মণ কুমারের কাছে গোপনে যাওয়া মনস্থ করেছেঙ্গ এখানেই দুটি ঘটনার সাদৃশ্যঙ্গ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list.'

এটিও শেক্সপীয়রের আর একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি থেকে সংগৃহীত, নাম —'ওথেলো' (Othello) এখানে আপাত-ভালমানুষ কিন্তু প্রকৃত শয়তান ইয়াগো ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর সন্দেহকে তীব্রতর করে তুলবার জন্য এরকম করে কথা বলছেঙ্গ কাপালিকও নবকুমারের মন কপালকুণ্ডলার প্রতি বিষিয়ে দেবার

জন্যই এই পরিচ্ছেদে এই ধরনের আচরণ করবেঙ্গ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্‌ঙ্গ'

মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য'-এর তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীতঙ্গ এটি দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তিঙ্গ মহাদেবের ধ্যানভ। করার জন্য মদন যখন নিজের মনস্থির করতে পেরেছে, তখনই ইন্দ্র মদনকে একথা বলেছিলেন—তবে সিদ্ধিলাভের জন্য যাও, দেবকার্য সুসম্পন্ন করঙ্গ এখানে কাপালিকও কপালকুণ্ডলাবধকে দেবকার্য হিসাবেই দেখাতে চেয়েছে এবং নিজ অক্ষম বলে এ কাজ করাতে চেয়েছে নবকুমারকে দিয়েইঙ্গ

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'Be at peace; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love.'

এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেছেন লর্ড লীটনের 'লুক্রেশিয়া' (Lucretia) উপন্যাস থেকেঙ্গ লুক্রেশিয়া যাকে ভালবাসতো, সে ভালবাসতো লুক্রেশিয়ার বোন সুসানকেঙ্গ সুসান এখানে ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার প্রেমিককে অনুরোধ করছে, সে যেন লুক্রেশিয়াকেই ভালবাসেঙ্গ এই পরিচ্ছেদে মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার কথাবার্তার মধ্যেও অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটেছে বলে 'লুক্রেশিয়া' উপন্যাসের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হতে পারেঙ্গ

অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'No spectre greets me – no vain shadow this.'

এই পংক্তিটি ইংরেজ-কবি William Wordsworth-এর Laodamia কবিতা থেকে সংগৃহীতঙ্গ ঈশ্বরের অনুগ্রহে লাওডেমিয়াও তার মৃত স্বামীর ছায়া দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মনে হয়েছে তা যেন ছায়া নয়, সজীবঙ্গ এখানেও ভবানীমূর্তি কপালকুণ্ডলার কাছে ছায়ার মত এলেও তা শুধু ছায়া নয়ঙ্গ

নবম পরিচ্ছেদ— 'বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎঙ্গ
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্‌ঙ্গঙ্গ'

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্‌' কাব্যের অষ্টম সর্গের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি এখানে শীর্ষ নির্দেশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছেঙ্গ প্রস।টি ছিল এইরকম—নারদের বীণা থেকে মালা খসে অজপত্নী ইন্দুমতীর ওপর পড়লে রানী মারা যানঙ্গ তা দেখে রাজা অজও মূর্ছিত হয়ে পড়েনঙ্গ এটাই যে স্বাভাবিক, সেটা বোঝাতে গিয়ে শ্লোকে বলা হয়েছে—হৃদয়েশ্বরীর হতচেতন দেহের সে। তাঁর পতি অজও ভূতলে পতিত হলেন, কারণ জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে এক বিন্দু তেল ক্ষরিত হলে জ্বলন্ত শিখারও কিছু অংশ ভূতলে পতিত হয়ঙ্গ বোঝাই যাচ্ছে, কপালকুণ্ডলার জলে পড়ে যাওয়ার সে। সে। নবকুমারের জলে ঝাঁপ দেওয়ার সে। এর স্পষ্ট সাদৃশ্যই এরকম উল্লেখের কারণঙ্গ

৩৭.৮ সার-সংক্ষেপ

এই এককে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি, একটি কাল্পনিক কাহিনীকে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক ছিলেনঙ্গ প্রথমত, তিনি সময়ের উল্লেখ করবার সময় খুব নির্দিষ্ট করে তা নির্দেশ করেছেন যাতে ঘটনাটা ওই বিশেষ সময়েই ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয়ঙ্গ অবশ্য

সেই সে। সেই বিশেষ সময়ে কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে যা সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য কী, এটাও মনে রেখেছেনঙ্গ

দ্বিতীয়ত, মুঘল রাজদরবারের কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্যও ছিল প্রধানত এই বাস্তবতা সৃষ্টি করাঙ্গ কারণ ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা আমরা সকলেই জানি, কল্পিত কাহিনীর সে। তাকে নিখুঁত ভাবে জুড়ে দেওয়া মানেই বাস্তবের সে। কল্পনার একটা গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়াঙ্গ

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের যেমন একটা করে নাম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার ঘটনা নির্দেশ করতে, যথা 'সাগরস ামে', 'উপকূলে', 'বিজনে', 'স্তূপশিখরে' প্রভৃতি, তেমনি কাহিনী শুরু করার আগে বিখ্যাত কোনও নাটক, কাব্য, কবিতা বা উপন্যাস থেকে একটি বিশেষ অংশ উদ্ধারও করেছেনঙ্গ আমরা প্রত্যেকটি অংশের উৎস নির্দেশ করেছিঙ্গ আসলে এই সব সাহিত্যিক সৃষ্টি এত বাস্তব হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে যে এগুলির উল্লেখ করলেই বর্তমান কাহিনীর বাস্তবতা যেন তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়ঙ্গ কাহিনীর বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার জন্য চরিত্রগুলিকেও বাস্তব করে তুলতে হয়ঙ্গ তা বঙ্কিমচন্দ্র করতে পেরেছেন কিনা সেটা আমরা পরের এককে দেখবোঙ্গ

৩৭.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি

উপন্যাসে লেখক গল্প বলেন, সেই গল্পকে বৃত্তে ভালভাবে বিন্যস্ত করেন, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—সবই তো আমরা দেখলামঙ্গ তাহলে চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে আবার আলাদা করে নজর দিতে হবে কেন, এ প্রশ্ন আপনাদের মাথায় জাগতেই পারেঙ্গ সেই কথাটাই একটু বুঝে নেওয়া দরকারঙ্গ

উপন্যাসে লেখক নিজে অবশ্য মন্তব্য করতে পারেন, ঘটনাবর্ণনাও করতে পারেন কিন্তু এটা তো আরো সত্যি কথা যে, চরিত্রগুলোকে ভালবেসে ফেলেন বলেই পাঠক গল্পটা পড়বার আগ্রহ বোধ করেনঙ্গ যে মানুষগুলি উপন্যাসে আছে, তারা যখন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে তখনই তো গল্পটাকে আমাদের আর বানানো বলে মনেই হয় না, তারা আমাদের খুব আপনজন হয়ে ওঠে, আমরাও আগ্রহভরে তাদের গল্প শুনিঙ্গ সুতরাং গল্পের মানুষগুলিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলতে হবে এটাও উপন্যাসের একটা শর্তঙ্গ সেই ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় কীভাবে করতে পেরেছেন সেটা আমাদের দেখতে হবেঙ্গ

তবে সেটা শুধুই প্রধান চরিত্রদের দিকে তাকিয়ে করলেই হবে না, খুব অল্প সময়ের জন্য হয়তো একটা চরিত্র দেখা গিয়েছে, সেটির প্রতিও ঔপন্যাসিক দৃষ্টি কেমন, এ থেকে লেখকের সামর্থ্য বোঝা যায়ঙ্গ তাই দুরকম চরিত্রের প্রতিই আমরা নজর রাখবো, অর্থাৎ চরিত্রগুলিকে লেখক কীভাবে প্রাণ দিতে পেরেছেনঙ্গ প্রথমে প্রধান চরিত্রগুলির কথাই ভেবে দেখা যাকঙ্গ

১.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

উপন্যাসের নাম থেকেও বোঝা যায়, কাহিনী থেকেও বোঝা যায়, নারীরাই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ, পুরুষরা নয়ঙ্গ বস্তুত, নবকুমার ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য পুরুষ এই উপন্যাসে আমরা খুঁজেও পাই নাঙ্গ কাপালিক অবশ্য গল্পের পরিণতি ঠিক করার ব্যাপারে অনেকটাই সাহায্য করেছে, যেমন নবকুমারের

দাম্পত্য জীবন গঠনের ব্যাপারে অধিকারীর ভূমিকাও রয়েছে অনেকখানিঙ্গ কিন্তু গল্পের নায়ক যাদের মনে করা হয়, ঠিক তেমন চরিত্র বলতে আমরা নবকুমারকেই বুঝে থাকিঙ্গ

নায়কের সাধারণত যেসব গুণ থাকা দরকার, নবকুমারের তার প্রায় সবই আছেঙ্গ বয়সে যুবক হলেও বিবেচনায় যে সে কারো চেয়ে কম নয়, প্রথম পরিচয়েই সে কতা আমরা বুঝতে পারিঙ্গ যেমন, ঘোর কুয়াশায় দিগভ্রান্ত হয়ে মাঝি যখন বুঝতেই পারছে না সে কেমন করে এ থেকে উদ্ধার পারে, তখন বৃদ্ধ তাকে তিরস্কার করলে নবকুমার বলেছিল, 'যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে?' এ সংবাদও পরে আমরা জানতে পারি যে সেই বৃদ্ধের বাড়িতে অন্য অভিভাবক কেউ নেই বলে তাঁকে সে এই গ।াসাগর যাত্রায় আসতে নিষেধ করেছিলঙ্গ পুণ্যের জন্য তীর্থে আসতেই হবে, এ কথাও সে মেনে নেয়নি, বলেছে, 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারেঙ্গ'

নবকুমার যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সেই সে। কাব্যরসিকও, সে কতা আমরা বুঝতে পারি বিস্তীর্ণ সমুদ্রস।ম থেকে দূরের আবছা তটভূমি দেখে নবকুমারের 'রঘুবংশম্' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ শ্লোক অর্থাৎ 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী .....' ইত্যাদি মনে পড়ে যাওয়ায়ঙ্গ যেরকম দুর্বিপাকে পড়ে যাত্রীরা সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থাতেও নবকুমার কাব্যরস আস্বাদন এবং সৌন্দর্য উপভোগের মত অবস্থায় আছে, এটা বড় কম কথা নয়ঙ্গ

নবকুমারের সাহসিকতারও প্রশংসা করতে হবে, কারণ যে অবস্থায় সে যে স্থানে বিসর্জিত হয়েছিল—'গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাক্ত; .....প্রাণনাশই নিশ্চিত'—তা সত্ত্বেও সে বালিয়াড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোতে পেরেছেঙ্গ নিদ্রাভ। হবার পর কাপালিকের মুখোমুখি হবার মত সাহসও তার ছিলঙ্গ

নবকুমারের পরোপকার ব্রতের কথা আমরা প্রথমেই জানতে পেরেছিঙ্গ অচেনা চর এবং বালিয়াড়ি বলে রান্নার উপযোগী কাঠ কাটতে যেতে কেউই রাজি হয়নি, নবকুমার রাজি হওয়ার পর শুধু একজনকে সী হতে বলেছিল, তাতেও কেউ রাজি হয়নিঙ্গ অগত্যা সে একাই অগ্রসর হয়েছিলঙ্গ

কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার মধ্যে একই সে। নবকুমারের মধ্যে বিবেচনাশক্তি এবং কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ দেখা যায়ঙ্গ অধিকারী নবকুমারের সে। কপালকুণ্ডলার বিবাহের প্রস্তাব করার পর সারা রাত যে নবকুমারের ঘুম হয়নি, উপন্যাসে তার প্রমাণ আমরা পাইঙ্গ সকালে নিজের সিদ্ধান্ত সে জানিয়েছে—'আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নীঙ্গ ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিবঙ্গ'

অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, নবকুমারের যে একটি বিবাহ আগে ছিল, সে জন্য সে চিন্তিত নয়, তাঁর চিন্তা অন্যঙ্গ একটি অজ্ঞাতকুলশীল কন্যাকে এভাবে বিবাহ করে নিয়ে গেলে হয়তো তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে, এই ভাবনাই সারা রাত তাকে ঘুমোতে দেয়নিঙ্গ কিন্তু একই সে। সে চিন্তা করে দেখেছেন, যে নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করেছে, তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া তার উচিত হবে না, কারণ ফিরে গেলে কপালকুণ্ডলার যে মৃত্যু সুনিশ্চিত, এ কথা অধিকারী তাকে বলেছিলেনঙ্গ

সৌন্দর্যপিপাসু নবকুমার যে বিবাহের পর কপালকুণ্ডলাকে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, তা আমরা

দেখেছিঙ্গ নিজের পরিবার যখন মৃণ্ময়ীকে সাদরে গ্রহণ করল তখন তার প্রেম আর কোন বাধা মানল নাঙ্গ কিন্তু সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করার পরও যদি কপালকুণ্ডলার মনে তিলমাত্র প্রভাব ফেলতে না পারে তবে ধীরে ধীরে অবসাদ তাকে গ্রাস করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই হয়েছিলঙ্গ তা না হলে কাপালিকের কথা অতো সহজে সে বিশ্বাস করত না, অথবা যে কপালকুণ্ডলাকে এত করেও সংসার এবং দাম্পত্য জীবনের কোন বোধ ও অনুভূতিই দিতে পারল না, সে কেমন করে দ্বিচারিণী হতে পারে, এ কথাও তার মনে হল নাঙ্গ ফলে সে কপালকুণ্ডলাকেও সুখী করতে পারল না, নিজেও সুখী হল নাঙ্গ

৩৭.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী-কন্যা, মনের সৃষ্টি—সুতরাং চরিত্রটি একদিকে রহস্যময়তা, অন্যদিকে সজীবতা ফোটাবার গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিলঙ্গ রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলবার জন্যই দুটি প্রধান উপাদান বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন—প্রথমত সর্বদাই তাকে অন্ধকার রাত্রি বা আলোছায়ার পরিবেশে দেখানো, দ্বিতীয়ত রাশি রাশি কালো চুলের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখাঙ্গ কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখার দৃশ্যটিই একবার মনে করে দেখুন—'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তিঙ্গ কেশভার—অবেণী সম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভারঙ্গ'

দ্বিতীয়বার যখন নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার দেখা হয় 'তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই' এবং পিঠে কোমলস্পর্শ পেয়ে পেছন ফিরে নবকুমার দেখেছে 'সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্য দেবীমূর্তিঙ্গ'

তৃতীয়বার মতিবিবির সঙ্গে। আলাপের জন্য যখন কপালকুণ্ডলার কাছে আসে তখন 'একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিলঙ্গ

সপ্তগ্রামের বাড়িতে কপালকুণ্ডলাকে যখন আমরা প্রথম দেখি শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, তখনও 'সন্ধ্যাকাল উপস্থিত' এবং কপালকুণ্ডলা 'অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্ধলুক্কায়িতাঙ্গ' বস্তুত এই পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার চুল বেঁধে দেবার জন্যই শ্যামাসুন্দরী সাধাসাধি করেছে কপালকুণ্ডলা রাজি হয়নিঙ্গ

পরবর্তীকালে চতুর্থ খণ্ডে অন্ধকার রাত্রে কপালকুণ্ডলার ওষধি খুঁজেতে যাওয়া, অন্ধকারে ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবির সঙ্গে। সাক্ষাৎ এবং বিষাদময় পরিণতির কথা আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু লক্ষ্য করবেন পটভূমি সবসময়েই অন্ধকার রাত্রিঙ্গ

তার অর্থ এই নয় যে চরিত্রটিকে শুধু রহস্যময়ই করে রাখবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেননিঙ্গ চরিত্রটি যাতে রক্তমাংসের সজীবতা লাভ করে সেজন্য তিনি যে কত সচেতন ছিলেন, একটু ব্যাখ্যা করলেই তা বোঝা যাবেঙ্গ

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখিয়েছিল, সেটা তার অন্তরের স্বাভাবিক কোমলতা হতে পারে, কিন্তু কাপালিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে অধিকারীর বাড়িতে নিয়ে আসায় করুণাবৃত্তির একেবারে চরম প্রকাশ দেখা যায়ঙ্গ এভাবে নবকুমারের প্রাণ বাঁচালে কাপালিক যে তাকে হত্যা করবে, এ কথা সে জানতো—অধিকারীর কাছে তা প্রকাশও করেছেঙ্গ তবু যে এ কাজ সে করেছে তাতে বোঝা যায় মানবিক অনুভূতি তার

মধ্যে পুরোপুরি বজায় আছেঙ্গ

সংসার ও সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ কপালকুণ্ডলা 'বিবাহ' শব্দের অর্থই বুঝতে পারেনি প্রথমে, অধিকারী কালিকা ও শিবের সম্বন্ধ এনে এটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেনঙ্গ সংসার সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার অনভিজ্ঞতা যে কত বেশি তা বোঝাবার জন্য তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত আপনাদের মনে করারঙ্গ মতিবিবি প্রচুর স্বর্ণালংকার পরিয়ে দিয়েছিল কপালকুণ্ডলাকে, রাস্তায় ভিখারি সাহায্য চাওয়াতে সমস্ত অলংকারগুলি সে তার হাতে খুলে দিয়েছেঙ্গ বিহ্বল ভিক্ষুক এদিক-ওদিক চেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছে, তখন—''কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?''

সপ্ত গ্রামের সংসারে এসে শ্যামাসুন্দরীর অবস্থা দেখেও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে কিছুই ধারণা জন্মায়নি, নবকুমার প্রবল প্রণয় কত দুর্লভ বস্তু একথা কখনই সে জানতে পারেনি, বরং সে বলেছে 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মেঙ্গ

এরপর যখন কপালকুণ্ডলার সে। আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন সে 'এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিনীঙ্গ' সাজসজ্জায় তার কিছু পারিপাট্য এসেছে, অলংকারও তার অ।ের ভূষণ হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলেম মনে হয় না, না হলে শ্যামাসুন্দরীকে বলতো না, 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে বিবাহ করিতাম নাঙ্গ'

অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার স্বভাবের পরিবর্তন হয়নিঙ্গ সংসার তার ভাল লাগে না, রাত্রে অরণ্যে ভ্রমণ করতে সে আনন্দ পায়, 'গৃহস্থের বউ-ঝি'র এই আচরণ ভাল কিনা সে প্রশ্নই তার মনে আসে নাঙ্গ যে পরোপকার বৃত্তি আমরা প্রথম থেকেই তার মধ্যে দেখেছি, সেই পরোপকার সাধনের জন্যই শ্যামাসুন্দরীর জন্য সে গভীর রাতে বনে ঢুকেছিল ওষধির সন্ধানেঙ্গ কাপালিককে একবার দেখা সত্ত্বেও ভয়ে সে এ কাজে বিরত হয়নিঙ্গ কাজেই চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি, এটাই আমাদের বলতে হবেঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের দাদার পরামর্শ যে পছন্দ হয়নি, উপন্যাসের পরিণতি সে কথা প্রমাণ করেঙ্গ আসুন চরিত্রটি এবার আমরা একেবারে আমাদের নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে দেখার চেষ্টা করি এবং এর কোন ত্রুটি দেখতে পাই কিনা তা দেখিঙ্গ

প্রথম কথা, 'কুচরিত্রা', 'অবিশ্বাসিনী' ইত্যাদি পদগুলি কপালকুণ্ডলা বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছে, যেমন—'আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' কিম্বা 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাওঙ্গ' প্রশ্ন হচ্ছে, দাম্পত্য সম্পর্কই যে বোঝে না, সংসারের রীতিনীতি এখনও যার কাছে অস্পষ্ট, সে এসব কথা জানল কী করে এবং এর অর্থই বা তার কাছে পরিষ্কার হয় কেমন করেঙ্গ

দ্বিতীয় কথা, যেখানে এক বছরেরও বেশি সময় বাস করছে, যাদের সে।, তাদের প্রতি একটা গভীর ভালবাসার সম্পর্ক এমনিতেই গড়ে ওঠার কথাঙ্গ মানুষের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, বাড়িতে একটি গৃহপালিত পশু থাকলেও তার বাড়ি সম্বন্ধে মায়া জন্মে যায়—আর কপালকুণ্ডলার মত কোমলহৃদয়া নারী এই সংসারকে ভাল বাসতে পারল নাঙ্গ সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণই তার জন্মাল নাঙ্গ এটা কি বিশ্বাস করা সহজঙ্গ

তৃতীয় কতা, কপালকুণ্ডলা লোকালয়বর্জিত স্থানে প্রতিপালিত হলেও সে মেয়েঙ্গ যখন মানবিক বৃত্তিগুলি তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে তখন জৈববৃত্তি জাগ্রত হবে না, এটা মনে করা অসম্ভবঙ্গ কাজেই নবকুমারের উন্মত্ত

ভালবাসার অর্থ সে বুঝতে পারবে নাঙ্গ একটি দম্পতি যেভাবে জীবনযাপন করে সেভাবে তারা জীবন কাটাবে না! জৈব প্রবৃত্তিকে কী করে একটি নারী ঠেকিয়ে রাখতে পারেঙ্গ তাহলে তার সন্তন সম্ভাবনা কি অনিবার্য ছিল না! আর সন্তান একবার জন্মগ্রহণ করলে একটি নারী কি আগের মত থাকতে পারে!

এই অসংগতির ব্যাখ্যা দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রেখেছেন নবকুমারের সে। বালিয়াড়ি ত্যাগের প্রাক্কালে দেবীর পা থেকে বিল্বপত্র স্খলিত হওয়াঙ্গ অশিক্ষিতা ও কাপালিকলালিতা মেয়ের মনে সংস্কার প্রবল হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা সক্রিয় থাকবে এবং একটি নারীর সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার রুদ্ধ করে দেবে, এটা আমাদের স্বাভাবিক বলে মনে হয় নাঙ্গ বরং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর অগ্রজ যা বলেছিলেন, সেই পরিণতিই যেন স্বাভাবিক হতো বলে আমাদের মনে হয়—'সন্তানাদি হইলে স্বামী-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবেঙ্গ'

প্রান্তলিপি

মতিবিবি চরিত্রটি এমনই প্রাণবন্ত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় যেন এই মেয়েটিকেই আমরা দেখতে পাইঙ্গ আপনারাও মিলিয়ে দেখতে পারেন, একটু অংশ তুলে দিচ্ছিঙ্গ 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে এক গুচ্ছ কবিতা আছে, তার 'নাগরী' কবিতা থেকে—

'ব্য।সুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণাঙ্গ
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রুপ বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজেঙ্গ
.....
আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে, চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরেঙ্গ'

৩৭.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

কপালকুণ্ডলার মত একটি বিচিত্র নারীকে উপন্যাস লিখবার বাসনা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জন্মায় তখন মতিবিবি চরিত্রের কথা তাঁর মাথাতেই ছিল নাঙ্গ আমাদের মনে হয়, তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কপালকুণ্ডলা সংসারজীবনে ফিরে এসেও সুখী হবে নাঙ্গ এটাকে নিশ্চিত করার জন্যই নবকুমারের প্রথম স্ত্রী এবং স্বামীকে অধিকার করার ও সপত্নীর প্রতি প্রতিহিংসার জন্য এই চরিত্রের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, যাতে কপালকুণ্ডলার বিষণ্ণ পরিণতি একেবারে সুনিশ্চিত হয়ঙ্গ

বোধহয় এই কারণেই মতিবিবি চরিত্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, তাকে স্বৈরিনী নারী হিসাবে আঁকবার চেষ্টাই তিনি করেছেন, কিন্তু শিল্পী যখন একটি চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির প্রচুর উপাদান পেয়ে যান তখন তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন নাঙ্গ ফলে চরিত্রটি সম্ভবত এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষনীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছেঙ্গ কপালকুণ্ডলা কল্পনার সৃষ্টি, তাকে বাস্তব করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তার অসংগতি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন নিঙ্গ মতিবিবি প্রয়োজনের সৃষ্টি, তাকে স্বৈরিনী ও প্রতিহিংসাপরায়ণা করবার সচেতন অভিপ্রায় সত্ত্বেও শিল্পীর প্রচ্ছন্ন সহানুভূমি তাকে সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেঙ্গ

চরিত্রটিকে দেখার আগে তার কথা আমরা শুনি কেবল লেখকের বর্ণনায়ঙ্গ নবকুমারের প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী বিয়ের পর পিত্রালয়েই থাকত, মাঝে মাঝে আসতোঙ্গ তেরো বছর বয়সে উড়িষ্যায় সপরিবার পাঠানের হাতে পরে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ঙ্গ ফলে নিজের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও

পদ্মবতী স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ঙ্গ পরবর্তী কালে এই নারী যে লুৎফ-উন্নিসা নাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনে ছদ্মবেশে মতিবিবি নাম গ্রহণ করে থাকে, তার পিতা আগ্রায় এসে আকবরের রাজদরবারে ওমরাহ হয়ে বসেছে, লুৎফ-উন্নিসা আগ্রায় এসে 'পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ্য ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হয়েছে, এসব সংবাদ আমরা পরে পেয়েছিঙ্গ জেনেছি, 'ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাইঙ্গ .....বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন নাঙ্গ মনে মনে ভাবলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? অর্থাৎ পদ্মাবতী এখন স্বৈরিণী নারী, এমনকি যুবরাজ সেলিমও তার অনুরক্তঙ্গ

মতিবিবিকে প্রথম আমরা দেখি ভাঙা পালকিতে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ঙ্গ রাতে নবকুমার কপালকুণ্ডলার সন্ধানে যাবার সময় এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলঙ্গ অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, কপালকুণ্ডলা কী না জানতে চাওয়ায় বলেছিল, 'আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছিঙ্গ'

তারপরই আমরা দেখেছি শুধু বাগবৈদগ্ধ্যে নয়, আচরণেও মতিবিবি আকর্ষনীয়াঙ্গ বিপদে পড়ে সে শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে নবকুমারের কাঁধে ভর দিয়ে সরাইখানায় এসেছেঙ্গ সেখানে নবকুমারের সে। কথোপকথনে তার বুদ্ধিমত্তা, শ্লেষবাণ সন্ধানের ক্ষমতা এবং পরিশীলিত রুচি প্রমাণিত হয়ঙ্গ

কপালকুণ্ডলাকে দেখতে গিয়ে নিজের সমস্ত অলংকার মতিবিবি কেন তাকে দান করেছিল স্পষ্ট করে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করা শক্ত নয়ঙ্গ তার আগের পরিচ্ছেদেই নবকুমারের নাম সে শুনেছে এবং একটি অব্যর্থ ইতি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন—'প্রদীপ নিবিয়া গেলঙ্গ' কপালকুণ্ডলাকে দেখতে যাবার সময় অবশ্যই তার মনে হয়েছে, যে জীবনে ফিরে যাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ, সেই জীবনেই এখন সে দর্শক মাত্রঙ্গ নবকুমারের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে সাজাতে পারেনি, এখন নবকুমারের পরিত্যক্তা স্ত্রী হিসাবে তার নবপরিণীতা বধূকে সাজিয়ে আংশিক তৃপ্তি পেতে চেয়েছেঙ্গ

তিনটি ব্যাপার এ থেকে প্রমাণিত হয়—মতিবিবির হৃদয়ের ঔদার্য এবং ফেলে আসা জীবনের জন্য স্তিমিত বাসনা ও নবকুমারের প্রতি এখনও সুপ্ত প্রেমঙ্গ এগুলিরই প্রকাশ দেখা যাবে পরবর্তী পর্যায়েঙ্গ যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠেছিল তার জীবনে তাকে ভুলে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে পরিবর্তিত জীবনের ভোগবিলাসকেই উত্তু। শিখরে টেনে তুলতে চেয়েছিলঙ্গ সে আশা যখন মিলিয়ে গেল, তখন এই জীবনের অপ্রাপ্তি তার মনে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হলঙ্গ বিনাদোষে একদিন যে স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আজ সেই অধিকার ফিরে পাবার জন্য সে ফিরে এল সপ্তগ্রামেঙ্গ কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ না করলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তাই কাপালিকের সে। সন্ধি করতে তার আপত্তি হয়নিঙ্গ কিন্তু লক্ষ করে দেখবেন, সহানুভূতি তার কপালকুণ্ডলার প্রতিও ছিল, কাপালিকের মত তার জীবনহানি সে চায়নিঙ্গ

আসলে মানুষের চরিত্র দোষগুণে ভরাঙ্গ কেবল দোষ বা কেবল গুণ থাকলে তাকে বাস্তব মানুষ বলে মনে করা শক্তঙ্গ কপালকুণ্ডলাকে তাই আমরা ততটা আমাদের কাছের মানুষ মনে করতে পারি না, যতটা পারি মতিবিবিকেঙ্গ মতিবিবির যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারিঙ্গ সে গিয়েছিল পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শনেঙ্গ ধর্মচ্যুত হয়ে তাকে যে মুসলমান হতে হয়েছিল সে দোষ তার নয়, কিন্তু তার ফলভোগ করল সে—নবকুমার তাকে ত্যাগ করলঙ্গ স্বাভাবিক জীবন থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে, সে মৃগয়া বৃত্তি গ্রহণ করবে, এটা কাম্য না হতে পারে কিন্তু এটাই তো ঘটে থাকেঙ্গ কিন্তু এই স্বৈরিণীবৃত্তি গ্রহণ করেও যে তার ভেতরের মানুষটা মরে

যায়নি, বঙ্কিমচন্দ্র ই িতে সে কথা অনেকবার বলেছেন, যেমন—‘পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলঙ্গ পাষাণ দ্রব হইতেছিলঙ্গ’

বস্তুত, নবকুমার যদি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করতো, তবে কপালকুণ্ডলার বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধনও বোধহয় সে করতে চাইত নাঙ্গ নবকুমার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখনই ‘দলিতফণা ফণিনীর’ মত সে ঘোষণা করেছে ‘তুমি আমারই হইবেঙ্গ’ এরপরই তার কাপালিকের স। মন্ত্রণা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং যাবতীয় অভিনয়ঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত চাননি, কিন্তু মতিবিবি যে কপালকুণ্ডলার চেয়েও স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর চরিত্র হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেইঙ্গ

৩৭.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

অপ্রধান শুধু নয়, একেবারে নগণ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে কতটা সতর্কতা এবং শৈল্পিব মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা আপনাদের মনে পড়বে যদি একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদের একটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করিঙ্গ নৌকা দিগ্ভ্রান্ত হয়েছে, বাঁচার আশা নেই শুনে পুরুষরা দুর্গানাম জপ করতে লাগল, মেয়েরা সুর তুলে কাঁদতে লাগল—‘একটি স্ত্রীলোক গ াসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল নাঙ্গ’

এই উপন্যাসে কাপালিককে অপ্রধান চরিত্র বলে আপনাদের মনে নাও হতে পারে, কারণ তার জন্যই নবকুমারের স। কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার তার জন্যই নবকুমারের জীবনে করুণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছেঙ্গ তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় কাপালিক অপ্রধান চরিত্র এই কারণে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য পেরিয়ে কোনো সজীবতা সে লাভ করেনিঙ্গ যে কপালকুণ্ডলাকে প্রায় আজন্ম সে লালনপালন করেছে, তাকে বধ করবার জন্য নিয়ে যাবার সময়ও সে একবারও ইতস্তত করেনিঙ্গ এইরকম একমুখী তীব্রতা নিয়ে কোনো চরিত্র সজীবতা লাভ করতে পারে নাঙ্গ সপ্তগ্রামে তার আসাটাও অবিশ্বাস্য, অধিকারী তাদের সন্ধান বলে দেবেন, এমন মনে হয় নাঙ্গ

অধিকারী চরিত্রটি আবার অন্য রকমের উদ্দেশ্যে সৃষ্টঙ্গ তবু এই চরিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে এবং সেই কারণেই চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়ঙ্গ প্রথমত তাঁর অন্তরে করুণাবৃত্তি আছে বলেই কপালকুণ্ডলাকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করার কথা তিনি বিবেচনা করেছেনঙ্গ কপালকুণ্ডলার প্রতি যে তাঁর যথার্থ স্নেহ ছিল, তার বোঝা যায় মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে আসা এবং কপালকুণ্ডলার সমব্যথী হয়ে অশ্রুবিসর্জনেঙ্গ অধিকারী যেভাবে নবকুমারকে বিবাহ করার জন্য রাজি করিয়েছেন তাতে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়ঙ্গ নিজেকে নিজেই তারিফ করে মনে মনে বলেছেন, ‘রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?’

তবু, চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু অসংগতি আছে, সেটা আপনাদেরও চোখে পড়তে পারে, যেমন ঘোর জ ল এবং বালিয়াড়ির মধ্যে লোকালয়বর্জিত স্থানে অধিকারী যেখানে থাকেন সেখানে ‘এক অত্যুচ্চ দেবালয় চূড়া’ এবং ‘তন্নিকটে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহ’ থাকাটা কিছুটা বিস্ময়করঙ্গ দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকারীর শিষ্যও দু-একজন এসে থাকে (কপালকুণ্ডলার কথা—‘যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে’ ইত্যাদি)ঙ্গ তৃতীয়ত সেখানে নাকি হিজলীর বহুলোক পুজো দেয়, অধিকারী বলেছেন—‘পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাইঙ্গ হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়ঙ্গ’

এত লোক যেখানে পূজা দেয় সেটি নির্জন স্থান হবে কেমন করেঙ্গ

নারী চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেতে পারে শ্যামাসুন্দরীঙ্গ বোঝাই যায়, কপালকুণ্ডলার উদাসীনতাকে স্পষ্টতর করবার জন্যই এই স্বামীপ্রেমবুভুক্ষু চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছেঙ্গ সে সময়ের কৌলীন্য প্রথার অসুন্দর দিকটিও এতে ফুটে উঠেছেঙ্গ নবকুমারের এই ভগ্নীর বিবাহ এক কুলীনের সে। হয়েছিল বলেই তার সপত্নীও ছিল অনেকঙ্গ শ্যামাসুন্দরী ছোটবেলায় শেখা ছড়া জানে, বৌদির কেশসজ্জার উৎসাহ তার আছে, মেয়েদের জীবনের 'পরশ-পাথর' যে পুরুষের প্রেম, সেকথা শ্যামাসুন্দরী জানে, এবং এও জানে যে 'সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে'—এর চেয়ে বড় চাওয়া মেয়েদের আর কিছু হতে পারে নাঙ্গ কেন মেয়েদের এত সাজসজ্জা, এ কথা বোঝাতে গিয়ে শ্যামা-সুন্দরী সুন্দর একটি উপমা দেয়, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ', কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাতেও যখন উদাসীন তখন তার গভীর হৃদয়বেদনা এই উক্তিতে ধরা পড়ে—'ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি নাঙ্গ কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাইঙ্গ কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম তবে ফুটিয়া সুখ হইতঙ্গ'

আসলে, শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে কাছে রাখবার জন্য, তাঁকে বশ করার জন্য ওষধি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর কপালকুণ্ডলা নবকুমারের আকুল প্রেম উপেক্ষা করে যোগিনী হয়ে বসে থাকে—এই বৈপরীত্যটি শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের সাহায্যে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছেঙ্গ

মেহেরউন্নিসা একটি ঐতিহাসিক চরিত্রঙ্গ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তার উল্লেখই শুধু আছে, চরিত্র হিসাবে তাকে ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ পাওয়া যায় নিঙ্গ তবু এরই মধ্যে কিন্তু চরিত্রের পাঠানোচিত দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার সেই সে। সেলিমের প্রতি তার আন্তরিক দুর্বলতাও ঢাকা থাকে নিঙ্গ মতিবিবি যখন জানায় মেহেরউন্নিসার প্রেমে মুগ্ধ সেলিম তাকে পাবার জন্য সব কিছুই করতে পারেন, তখন মেহেরউন্নিসা বলে, 'বৈধব্যের আশঙ্কাঙ্গ শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহেঙ্গ' মতিবিবি যখন চিত্রাঙ্কনে তার দক্ষতার প্রশংসা করে বলে অন্যের এ ক্ষমতা থাকলে মেহেরউন্নিসার অপূর্বরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত থাকতো, মেহের বলে, 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবেঙ্গ' ফের এই মতিবিবিই যখন সংবাদ দেয় আকবরের মৃত্যু হয়েছে, সেলিম এবং সিংহাসনে, মেহের-উন্নিসা চোখের জল সামলাতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করে বলে, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

এত স্বল্প অবসরে চরিত্র অঙ্কনের এমন দক্ষতা অল্পই দেখা যায়ঙ্গ

৩৭.১০ সার-সংক্ষেপ

এখানে আমরা চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণভাবে মূল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কীরকম দক্ষতা দেখিয়েছেন সেটা বুঝবার চেষ্টা করেছিঙ্গ প্রথমেই প্রধান চরিত্র এবং অপ্রধান চরিত্রের পার্থক্যটা আমরা বুঝে নিয়েছি এবং অপ্রধান চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারেও লেখকের দৃষ্টি কেন থাকা দরকার, সে কথা বলেছিঙ্গ

এবার প্রধান চরিত্রের মধ্যে আলোচনা করেছি নবকুমার, কপালকুণ্ডলা এবং মতিবিবিরঙ্গ উপন্যাসটি নারীপ্রধান বলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নবকুমার চরিত্রটি বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও, এখানে ঘটনা বলতে যা আছে তাতে নবকুমারের ভূমিকা অল্পঙ্গ কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি কত যত্নে বঙ্কিমচন্দ্র আঁকবার

চেষ্টা করেছেন সে কথা আলোচনা করা হয়েছেঙ্গ রহস্যময়তা ও বাস্তগুণের সংমিশ্রণে চরিত্রটি অভিনব হয়ে উঠেছেঙ্গ কিন্তু আরো বেশি সজীব চরিত্র হয়েছে মতিবিবি, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই বোধহয় একমত হবোঙ্গ

অপ্রধান চত্রি নির্মাণেও বঙ্কিমচন্দ্র কত দক্ষ ছিলেন তা আমরা দেখিয়েছি এবং এই দক্ষতা কাপালিক, অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী এবং মেহের-উন্নিসার চরিত্রসৃষ্টিতে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সেটা দেখিয়ে এ প্রস। শেষ হয়েছেঙ্গ

৩৭.১১ কপালকুণ্ডলার শ্রেণীবিচার

একটি উপন্যাসের পরিচয় সম্পূর্ণ জানা না হলে তার শ্রেণীবিচার করা শক্তঙ্গ এখন আমরা তার পরিচয় মোটামুটিভাবে সব দিক থেকেই জানি, বলতে পারিঙ্গ যিনি প্রথম এই উপন্যাস পড়তে যাবেন, একটা ব্যাপারে তাঁর একটু খটকা লাগতে পারে, কারণ 'কপালকুণ্ডলা' নাম হিসাবে কিছুটা বিস্ময়কর, যখন দেখা যাবে এর অন্যতম প্রধান নারীচরিত্রের নামই এই, তখন বিস্ময় আরো বাড়বে, কারণ এরকম নাম সাধারণত কোন স্ত্রীলোকের হয় নাঙ্গ

এ বিষয়ে যাঁরা কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, নামটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটক থেকেঙ্গ সেখানেও অঘোরঘন্ট নামে এক কাপালিক আছে এবং তাঁর এক শিষ্যাও আছে কপালকুণ্ডলা নামেঙ্গ তবে আপনারা যদি সেই নাটক পড়েন, তাহলে দেখবেন, যেখানে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি উপন্যাসের চরিত্রের ঠিক বিপরীত আমাদের কপালকুণ্ডলা কাপালিকের গ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, ভবভূতির কপালকুণ্ডলা কাপালিকের জন্য নরবলির জোগাড় করেঙ্গ

আসলে, এই উপন্যাসের উৎস সম্বন্ধে আমরা জানি, এটি বঙ্কিমচন্দ্রে একটি পরীক্ষামূলক গ্রন্থঙ্গ মনের একটি গভীর চিন্তাকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেনঙ্গ যে মেয়ে প্রায় আজন্ম লোকালয় থেকে দূরে আছে, যৌবনে তার বিবাহ দিলে সে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারবে কিনা, এই ছিল প্রশ্নঙ্গ এটা দেখাবার জন্য একটি মেয়েকে নিতান্ত শৈশবে কোন নির্জন জায়গায় নির্বাসিত দেখাতে হয়ঙ্গ তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, নির্জন বালিয়াড়িতে কাপালিক এই মেয়েকে লালিত করেছেঙ্গ কাপালিকের দেওয়া নাম এই ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এটি কালীর নামান্তরঙ্গ অধিকারী নিজেও স্নেহভরে কখনও কখনও তাকে কাপালিনী বলে ডেকেছেনঙ্গ যাইহোক, একে আমরা কোন জাতীয় সৃষ্টি বলবো সে ব্যাপারে এবার চিন্তা করা যাকঙ্গ

৩৭.১১.১ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্য

কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, কপালকুণ্ডলা আসলে একটি গদ্য কাব্যঙ্গ একথা অবশ্য ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হনঙ্গ এ কথাও মিথ্যা নয় যে কপালকুণ্ডলার মধ্যে এমন এক গভীর অনুভূতিমূলক চিন্তা আছে, মহৎকাব্যেই সেরকম চিন্তা দেখা যায়ঙ্গ তাছাড়া এমন এক রহস্যময় পরিমণ্ডল বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন—নির্জন সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, দৈবদুর্বিপাকে নবকুমারের সেখানে নির্বাসন, রহস্যময় কাপালিক, তার চেয়েও রহস্যময়ী নারী কপালকুণ্ডলা এবং তার ব্যাকুল আহ্বান—

সমস্ত মিলে একটা কাব্যিক ব্যঞ্জনাই যে ফুটে ওঠে, এ কথা অস্বীকার করা যায় নাঙ্গ

এই গ্রন্থের কাব্যিক লক্ষণ আরো আছেঙ্গ সমগ্র গ্রন্থে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র যার কাব্যিক সুষমা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেঙ্গ দু-এক পংক্তি উদ্ধার করলে আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন—'মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় নাঙ্গ অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে, না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় নাঙ্গ'

গ্রন্থের মধ্যে মধ্যেই এমন কিছু ব্যঞ্জনধর্মী পংক্তি আছে যার সাক্ষাৎ কাব্যেই পাওয়া স্বাভাবিক, যেমন—

ক) ''মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পারি না?'
নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্মাঙ্গ'
প্রদীপ নিবিয়া গেলঙ্গ''

খ) 'ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাইঙ্গ এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাইঙ্গ'

গ) 'লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন নাঙ্গ পাষাণমধ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলঙ্গ পাষাণ দ্রব হইতেছিলঙ্গ'

এত কাব্যিক লক্ষণ সত্ত্বেও বলতে হবে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য কাব্য নয়, কারণ কাব্যের আখ্যান এবং চরিত্রসৃষ্টির কোন দায় থাকে নাঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে এর আখ্যান রচনা করেছেন তাই নয় সেই আখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য কার্যকারণ শৃঙ্খল সমন্বিত সুবিন্যস্ত বৃত্তে পরিণত করেছেনঙ্গ চরিত্র শুধু আখ্যানের অবলম্বন হিসাবে আসে নি, তাদের জীবন্ত করার আপ্রাণ চেষ্টাও তিনি করেছেনঙ্গ সুতরাং কাব্যিক সুষমা এর উপভোগ্যতা অনেক বাড়াতে পারে, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে একে গদ্য কাব্য বললে এর প্রতি সুবিচার করা হবে না বলেই আমরা মনে করিঙ্গ

৩৭.১১.২ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি উপন্যাস

উপন্যাসের যেসব লক্ষণের কথা আমরা জানি, সেগুলি মনে রেখে বিচার করতে গেলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে কপালকুণ্ডলা একটি উপন্যাসঙ্গ কারণ উপন্যাসের যে লক্ষণগুলি ২ নং এককে আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন সেগুলিই একবার মনে করুনঙ্গ এর মধ্যে উপন্যাসের দুটি শর্ত, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ছাপাখানার আবিষ্কার আমরা বাদ দিয়ে শুধু লক্ষণগুলি বিচার করছিঙ্গ

ক) উপন্যাসে আমরা প্রথম পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্পঙ্গ 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে দৈবী সংস্কার ও বিশ্বাসের একা পরিমণ্ডল আছে বটে, কিন্তু এ গল্প মানুষের গল্প এবং সুনিশ্চিত ভাবে মানুষেরই গল্পঙ্গ নবকুমার সৌন্দর্যপ্রেমিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক একটি যুবক, নানারকম ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রথমা স্ত্রীকে হারিয়েছিল, আবার জীবনে কৃতজ্ঞতাসূত্রে একটি নারী এসেও ছিলঙ্গ তাকে নবকুমার হৃদয়ের সংরক্ত প্রেম নিবেদন করেছিল, ভালবাসার একটি সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছিলঙ্গ কিন্তু সেই নারী যেহেতু ভিন্ন পরিবেশে মানুষ, লোকালয় ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা অল্প, সুতরাং সংসারজীবন সম্বন্ধে তার উদাসীনতা কাটেনিঙ্গ নবকুমার সুখী হয়নি, কারণ তার হৃদয়ে প্রেম সে জাগ্রত করতে পারে নিঙ্গ পাশাপাশি পেয়েছি জীবনতৃষ্ণার প্রতীক স্বরূপ নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে, প্রেম না পেলে নিজের দাম্পত্য

অধিকারে যা সে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ছলে-বলে কৌশলেঙ্গ কাজেই এই আদ্যন্ত মানবিক বিষয়টি যে অবশ্যই উপন্যাসের উপযোগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেইঙ্গ

খ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রাণঙ্গ উপন্যাস সৃষ্টির আগে রূপকথার গল্প, দেবদেবীর গল্প অনেক প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেসব ছিল অলৌকিকঙ্গ উপন্যাস মানুষের গল্প বলেই সেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার একটা ব্যাপার আছেঙ্গ সেই কারণেই উপন্যাসে বৃত্ত নির্মাণ করতে হয় যাতে সমগ্র গল্পটা বাঁধা থাকে একটা কার্যকারণ সূত্রেঙ্গ আমরা দেখেছি, ঠিক সেই নিয়ম মেনেই কপালকুণ্ডলার গোটা গল্পটাই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুচিন্তিত বৃত্তে বা plot-এ রূপায়িত করেছেনঙ্গ কাজেই সেদিক থেকেই একে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হবেঙ্গ

গ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের একটি নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকা প্রয়োজনঙ্গ সেটি যে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ছিল,—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেইঙ্গ সেই জন্যই অন্যান্যদের মতকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী জীবনের যে রূপ প্রতিভাত হওয়া উচিত, চরিত্র যেরকম আচরণ করা উচিত বলে মনে হয়েছে, তাই তিনি দেখিয়েছেনঙ্গ মানুষ পশু নয় বলেই প্রাথমিক জীবনাচরণের প্রভাব তার জীবনে অলঙঘ্য, দাম্পত্য জীবনের মূল প্রেমে, জৈব তাড়নায় নয় এবং সেই প্রেম জীবনের ষোল বছর পর্যন্ত যার মনে জাগবার কোন অবকাশই ছিল না, পরেও পরিণত হবার পর তা জাগতে পারে না—এই ধরনের একটা জীবনবোধই মনে হয় এখানে প্রকাশিত হয়েছেঙ্গ কাজেই এই গ্রন্থকে উপন্যাস আখ্যা না দেবার কোন কারণ নেইঙ্গ

৩৭.১১.৩ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি রোমান্স

কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস হিসাবে স্বীকার করে নিলেও আমরা দেখবো, এটি একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাস, কারণ এখানে যেসব পাত্রপাত্রীর সে। আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তারা কেউই আমাদের খুব পরিচিত নয়ঙ্গ

উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমাদের পরিচিত কিনা, উপন্যাসের ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে কিনা, এইসব বিচার থেকে উপন্যাসকে যে দুটিভাগে ভাগ করা হয়, সে কথা আমরা জানিঙ্গ যেখানে আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও ঘটনা আহরণ করা হয়, তাকে আমরা বলি 'নভেল' এবং যেখানে পাত্রপাত্রী আমাদের অপরিচিত, ঘটনাধারাও ঠিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, অথচ মানবিক সুখদুঃখের কাহিনী এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, যাতে আধুনিক পাঠকের তাতে উৎসাহিত হবার কারণ থাকে, সে ধরনের উপন্যাসকে আমরা বলি 'রোমান্স'ঙ্গ কপালকুণ্ডলায় যেহেতু এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির ঘটেছে অথচ তীব্র মানবিক আখ্যান আমাদের কাছে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, একে আমরা 'রোমান্সজাতীয় উপন্যাস' হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে পারিঙ্গ

৩৭.১১.৪ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

রোমান্সজাতীয় উপন্যাসেরও দুটি ভাগ আছে, সে কথা আমরা জানিঙ্গ যে রোমান্সের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় ইতিহাস থেকে, তাকে আমরা বলি 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং যে রোমান্সের বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনাতেই প্রথম দেখা দেয়, তারপর বাস্তব পরিবেশ, বিশ্বাসযোগ্য পাত্র-পাত্রী এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য কাহিনীর দ্বারা সাহিত্যে তার রূপ দেবার চেষ্টা করেন, তাকে বলা হয় 'কাবিযক রোমান্স'ঙ্গ

একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো, 'কপালকুণ্ডলা'কে আমরা 'কাব্যিক রোমান্সে'র পর্যায়েই ফেলতে পারিঙ্গ এখানে অবশ্য ইতিহাসের কিছু অনুষ। আছে, সম্রাট আকবরের মৃত্যু এবং যুবরাজ সেলিমের রাজত্বভার গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক পর্বকেও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তা সবই এসেছে একটি উপকাহিনীর চরিত্র মতিবিবির মাধ্যমেঙ্গ কাজেই এর দ্বারা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য কিচুটা সৃষ্টি হয়েছে বটে, সমগ্র কাহিনীটির বাস্তবতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল পরিকল্পনা যে 'কাব্যিক রোমান্সে'র সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহঙ্গ

'কাব্যিক রোমান্সে'র জন্ম যেভাবে হয়, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যাবে,—এর সৃষ্টিও সেইভাবেই হয়েছেঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, জীবন বিষয়ে একটি জটিল জিজ্ঞাসা আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হয়েছিলঙ্গ সেই জিজ্ঞাসার কতা আমরা বার বার বলেছি, সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই বোধ হয়ঙ্গ মনের এই প্রশ্নটির সাহিত্যিক মীমাংসা খুঁজবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাল্যকালে খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত' এবং 'সমুদ্রতীরে ত্যক্ত' একটি নারীর কথা কল্পনা করতে হয়েছিল, তন্ত্রসাধক কাপালিকের দ্বারা লালন এবং কপালকুণ্ডলা নামকরণ করাতে হয়েছিল, নবকুমারকে দৈব দুর্বিপাকে সেখানে নিয়ে যেতে হয়েছিল, ঘটনাক্রমে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসাযী করতে হয়েছিল এবং লোকালয়ে বসবাসের ব্যবস্থাও করতে হয়েছিলঙ্গ তারপর দেখাতে হয়েছিল মূলত তার সংসার ও দাম্পত্যজীবনে অনীহা এবং সপত্নী পদ্মাবতীর প্রতিহিংসা সাধনের প্রচেষ্টার কীভাবে তার জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এলঙ্গ কাজেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দিক থেকে একে অবশ্যই বলতে হবে কাব্যিক রোমান্সঙ্গ

তবে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে প্রক্রিয়ার মিল থাকলেই তাকে যথার্থ 'রোমান্স' আমরা আখ্যা দিতে পারি না, কাহিনী বাস্তব করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও নিষ্ঠা লেখকের থাকা প্রয়োজনঙ্গ তাও যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছিঙ্গ সুতরাং কপালকুণ্ডলার শ্রেণী সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সংশয় থাকতে পারে নাঙ্গ

৩৭.১১.৫ সার-সংক্ষেপ

উপন্যাসের আলোচনা সব দিক থেকে করা হলে, বলা সম্ভব এটি কী জাতীয় উপন্যাস বা আদৌ উপন্যাস কিনাঙ্গ 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থটির আলোচনা মোটামুটি ভাবে শেষ হয়েছে, সুতরাং এইবার আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারিঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা'কে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 'গদ্যকাব্য' কারণ এর মধ্যে লেখকের এক গাঢ় অনুভূতির প্রকাশ আমরা দেখি, সর্বব্যপ্ত একটা রহস্যময় পরিমণ্ডলী দেখি এবং পাত্র-পাত্রীদের আচরণও কেমন রহস্যময় মনে হয়ঙ্গ এ ছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় এমন কাব্যিক ভাষার ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাঝে মাঝে এমন ব্যঞ্জনাময় উক্তি করেছেন যে একে কাব্য বলে ভুল করা অসম্ভব নয়ঙ্গ তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এটি কাব্য নয়, এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত আছে এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছেঙ্গ কোন কাব্যেরই এগুলি থাকে নাঙ্গ সুতরাং একে 'কাব্য' বলা বোধহয় ঠিক হবে নাঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাসই বলতে হবে, তবে 'নভেলজাতীয় উপন্যাস' নয়, 'রোমান্স ধরনের উপন্যাস'ঙ্গ 'রোমান্স'ও দুরকমের হতে পারে—'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং 'কাব্যিক রোমান্স'ঙ্গ এদের যেসব লক্ষণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, তা মনে রাখলে একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগত হবেঙ্গ

৩৭.১২ সারাংশ

'কপালকুণ্ডলা'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎঙ্গ তাঁর সমকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তিনিই প্রথম উপন্যাসে প্রাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারিঙ্গ দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে ব্যপৃত থেকেও সাহিত্যের সৃজনশীলতায় তিনি অত্যন্ত সাফল্যের স েই বিচরণ করেছেনঙ্গ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'ঙ্গ

উপন্যাস আধুনিক কালের ফসল, যখন মানুষ দেবকেন্দ্রিক মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে মানবজগৎ সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠছেঙ্গ তাই সব উপন্যাসই মানুষের গল্প, মানবিক অনুভূতির গল্পঙ্গ কখনও সে সুদূর ইতিহাসচারী বা কল্পনাপ্রসূত মানুষের রোমান্সধর্মী চরিতকথা, কখনও বা সে বাস্তব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানবজীবনের প্রতিলিপি, নভেলঙ্গ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডার—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই পূর্ণ হয়ে উঠছিল, যার মধ্যে অন্যতম সফল অবদান—বঙ্কিমচন্দ্রেরঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা'র মূলকানিহী নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কেন্দ্রিক হলেও তাতে দুটি উপকাহিনী সংযোজিত হয়েছে—মতিবিবির গল্প ও শ্যামাসুন্দরীর গল্পঙ্গ এই দুটি কাহিনী উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে, গল্পের পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং এই দুই চরিত্রের তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্যজীবনের তৃষ্ণার বিপরীতে কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছেঙ্গ

এই উপন্যাসের কাহিনীকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সময় নির্ধারণের দিকে লেখক সচেতন দৃষ্টি দিয়েছেনঙ্গ স্পষ্ট সময় নির্দেশ বা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য মূলকাহিনীকে সম্ভাব্যতার জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেঙ্গ কল্পিত কাহিনীর সে ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবারফলে সমগ্র কাহিনী পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে অতি সহজেইঙ্গ

সমগ্র উপন্যাসটি নারীপ্রধানঙ্গ নবকুমার বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও ঘটনাবলীতে তার ভূমিকা গৌণঙ্গ রহস্যময়তা ও বাস্তবগুণের সংমিশ্রণে কপালকুণ্ডলা লেখকের এক অভিনব সৃষ্টিঙ্গ তবে পাশাপাশি মতিবিবির চরিত্রটি বরং অধিকতর সজীব, মনোগ্রাহীঙ্গ বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রের নির্মাণেও লেখকের যত্ন ও দক্ষতা আমাদের চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়েঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা'-র রহস্যময় পরিমণ্ডলী, কাব্যিক ভাষারীতি, ব্যঞ্জনাময় উক্ত এবং প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশময়তা অনেকের কাছেই একে 'গদ্যকাব্য'-এর পরিচয়ে উপনীত করেছেঙ্গ কিন্তু যেহেতু এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে যা কোনো কাব্যে থাকে না, সেই হেতু একে 'কাব্য' বলা ঠিক নয়ঙ্গ এটি উপন্যাসই, তবে এর বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ অনুযায়ী একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগতঙ্গ

৩৭.১৩ অনুশীলনী

অনুশীলনী ৫২

১) এ কথা কি ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র একাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.—পরীক্ষায় পাশ করেন?

২) বঙ্কিমচন্দ্র মোট কটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন?

৩) যে মন্তব্যটি সঠিক সেটি চিহ্নিত করুন—

ক) বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসই রচনা করেছেনঙ্গ

খ) বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রবন্ধই রচনা করেছেন

গ) বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে কিছু রচনা করেন নিঙ্গ

ঘ) উপন্যাস এবং প্রবন্ধ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিছু ইংরেজি রচনাও আছেঙ্গ

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুনঙ্গ

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের —— উপন্যাস নয়, —— উপন্যাসঙ্গ

অনুশীলনী ৫৩

১) মধ্যযুগের আখ্যানের সে। উপন্যাসের আখ্যানের কোনও পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেটা কী?

২) উপন্যাস সৃষ্টির জন্য এমন দুটি শর্তের কথা বলুন যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলঙ্গ

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি কী বলুনঙ্গ

৪) মন্তব্যগুলির সত্যাসত্য বিচার করুন এবং অসত্য হলে তার কারণ বুঝিয়ে দিনঙ্গ

ক) নভেলে থাকে আমাদের চেনা মানুষের গল্পঙ্গ

খ) ইতিহাস থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেই তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয়ে যায়ঙ্গ

গ) কাল্পনিক ধারণা নিয়ে যুক্তিসংগত ভাবে আখ্যান রচনা করলেই তা কাব্যিক রোমান্স হতে পারেঙ্গ

ঘ) রোমান্স মানেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়াঙ্গ

৫) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌গুলি নভেল এবং কোন্‌গুলি ঐতিহাসিক রোমান্স তার শ্রেণীবিভাগ করুনঙ্গ

৬) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা নভেল রচনার চেষ্টা হয়েছিল কি? হলে সেরকম গ্রন্থগুলির নাম করুনঙ্গ

৭) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ঐতিহাসিক রোমান্স রচিত হয়েছিল কি? হলে কার লেখা, কী গ্রন্থ? তাকে উপন্যাস বলা যায় কি?

৮) প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম এবং গ্রন্থনাম ভুলভাবে সাজানো আছে, আপনি সঠিকভাবে সাজিয়ে দিন—

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	টেকচাঁদ ঠাকুর	নববাবুবিলাস
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	প্রমথনাথ শর্মা	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নকসা

অনুশীলনী ৫৪.৩

১) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে পান?

২) উপকাহিনী কাকে বলে? উপন্যাসে উপকাহিনীর দরকার হয় কেন?

৩) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে উপকাহিনী আছে কি? কী জন্য লেখক সেগুলি সৃষ্টি করেছেন?

৪) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিনঙ্গ

ক) কপালকুণ্ডলার আর একটি নাম— বনবালা / কপালিকা / মৃণ্ময়ীঙ্গ

খ) নবকুমারের প্রথম স্ত্রী নাম— পদ্মাবতী / মতিবিবি / লুৎফ-উন্নিসা / সবগুলিই / কোনটিই নয়ঙ্গ

গ) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষে মৃত্যু হল— কাপালিকের / মতিবিবির / কপালকুণ্ডলার / নবকুমারের / কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের / ঠিক জানা যায় নাঙ্গ

ঘ) কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে রক্ষা করেছিল— কপালকুণ্ডলা / অধিকারী / দুজনেইঙ্গ

অনুশীলনী ৫৪.৫

১) কাহিনী এবং বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য কী?

২) সাধারণভাবে বৃত্ত কত রকমের ও কী কী?

৩) বাক্যগুলির একটি 'হ্যাঁ' বা 'না' বসান—

ক) কপালকুণ্ডলার শুধু কাহিনী আছে, বৃত্ত নেই—

খ) কপালকুণ্ডলায় কোনো স্বপ্নদৃশ্য নেই—

গ) উপকাহিনীর আলোচনা বৃত্তগঠনের মধ্যেই পড়ে—

অনুশীলনী ৫৪.৭

১) কপালকুণ্ডলা-র কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির কী দরকার ছিল, তার দুটি কারণ উল্লেখ করুনঙ্গ

২) ক) যুবরাজ সেলিমের পিতা কে? খ) সেলিমের প্রধান মহিষী কে ছিলেন? গ) শেষ আফগানের স্ত্রীর নাম কি? ঘ) তাঁকে সেলিম গ্রহণ করেছিলেন কি না উপন্যাসে তার উল্লেখ না থাকার কারণ কি?

৩) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন—

ক) মোট কতগুলি শীর্ষ উদ্ধৃতি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে?

খ) নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের কোন্ কোন্ নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতি দিয়েছেনঙ্গ

গ) সংস্কৃত কোন্ কোন্ কবির কী কী নাটক ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

ঘ) বাংলা কোনও কাব্য ও নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও উদ্ধৃতি দিয়েছেন কি?

ঙ) ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাদের কবিতার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে?

৪) বাঁদিকে কিছু গ্রন্থের নাম আছে, ডানদিকে সাহিত্যিকদের নামঙ্গ গ্রন্থের পাশে সঠিক গ্রন্থকারের যে ক্রম উল্লেখ আছে, সেটি বসানঙ্গ

প্রকৃত নাম	**গ্রন্থনাম**
কমেডি অব এররস ( )	ক) লর্ড বায়রন
মেঘনাদবধ কাব্য ( )	ক) কালিদাস
নবীন তপস্বিনী ( )	গ) কবীন্দ্র ভট্টাচার্য
লুক্রেশিয়া ( )	ঘ) শেকস্‌পীয়র
উদ্ধব দূত ( )	ঙ) মধুসূদন দত্ত
লাওডামিয়া ( )	চ) জন কীটস
লেইজ অব এনশেন্ট রোম ( )	ছ) লর্ড লীটন
ওড টু এ নাইটিংগেল ( )	জ) ওয়র্ডসওয়র্থ
ডন জুয়ান ( )	ঝ) মেকলে
মেঘদূতম্ ( )	ঞ) দীনবন্ধু মিত্র

অনুশীলনী ৫৪.৯

১) চরিত্রসৃষ্টি বলতে আপনি কী বোঝেন?

২) কপালকুণ্ডলার পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে কাকে প্রধান মনে করেন, বুঝিয়ে দিনঙ্গ

৩) কপালকুণ্ডলার নারীচরিত্রদের মধ্যে আপনি কাকে প্রধান্য দেবেন বুঝিয়ে বলুনঙ্গ

৪) উক্তিগুলি সত্য হলে পাশ টিক চিহ্ন (√) দিন, ভুল হলে ক্রশ চিহ্ন (×) দিন—

ক) কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে আনার সময় নবকুমারের মাতা জীবিত ছিলেন—

খ) শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের একমাত্র ভগিনী—

গ) কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করতে নবকুমারের মা প্রথমে রাজি হয়নি—

ঘ) মতিবিবি আগ্রায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন—

ঙ) বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের দুটি হাতই ভেঙে গিয়েছিল—

চ) অধিকারীর ভবানীমন্দিরে কেউ কখনও পূজা দেয় নি—

অনুশীলনী ৫৪.১১

১) 'কপালকুণ্ডলা' নামটি কি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই কল্পনা? উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্রের নাম এমন অদ্ভুত কেন?

২) গ্রন্থের শ্রেণীবিচার বলতে কী বোঝায়? 'কপালকুণ্ডলা'র শ্রেণীবিচার করার জন্য আমরা কীভাবে অগ্রসর হবো?

৫৪.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী

১) 'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাস না বলে অনেকে কাব্য বলতে চেয়েছেনঙ্গ এ বিষয়ে আপনার মতামত জানানঙ্গ

২) এক সমালোচকের মতে 'কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাস নয়; ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাট্যঙ্গ' আপনি এই মত সমর্থন করেন কি?

৩) 'কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে'র শ্রেণীবিচার করুনঙ্গ

৪) উপন্যাসে উপকাহিনীর প্রয়োজন হয় কেন? কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উপকাহিনী কী? এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আপনার মনে হয় কি?

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের কোন পরিচয় আছে বলে মনে করেন কি? উপন্যাসের মত আধুনিক সাহিত্যে এর কি কোন দরকার ছিল?

৬) কপালকুণ্ডলাকে প্রায় সর্বদাই অন্ধকারে দেখানো হয়েছে, দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাকে আমরা বিশেষ দেখতে পাইনাঙ্গ এর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

৭) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎস কী? এ বিষয়ে যা জানা যায় তার পরিচয় দিনঙ্গ

৮) কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা ভেবেছেন এবং পরিণতি যেরকম দেখিয়েছেন, তা কি আপনার স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে এর স্বাভাবিক পরিণতি কী হতে পারতো বলে আপনি মনে করেন?

৯) গ্রন্থের নাম যখন 'কপালকুণ্ডলা' তখন কপালকুণ্ডলাকেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকা করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন মতিবিবিই অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেঙ্গ এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

১০) 'কপালকুণ্ডলার' কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিনঙ্গ এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সতর্ক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও একে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা সংগত নয় কেন, বুঝিয়ে দিনঙ্গ

৩৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ব।সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

২) শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

৩) প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত ঃ উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম

৪) মোহিতলাল মজুমদার ঃ বঙ্কিম-বরণ

৫) বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৩৭.১৫ উত্তরমালা

উত্তর — ৫২

১) নাঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্নাতক পরীক্ষা বা বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর সে। আরো একজন পাশ করেন—যদুনাথ বসুঙ্গ

২) এগারোটি পূর্ণা। উপন্যাস আর তিনটি ছোট উপন্যাস বা খণ্ডোপন্যাসঙ্গ অবশ্য ইংরেজি উপন্যাস 'Rajmohan's Wife'-এর কথা ধরলে পূর্ণা। উপন্যাস হবে বারোটিঙ্গ

৩) (ঘ)

৪) [কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্বন্ধে আপনি এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই জানেন না, কেবল কোন্‌টি প্রথম বা দ্বিতীয় সেটুকুই জানেনঙ্গ তাই শূন্যস্থান পূরণও সেইভাবেই করবেন—]

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়, দ্বিতীয় উপন্যাসঙ্গ

[এক্ষেত্রে আপনাকে Rajmohan's Wife-এর কথা মনে রাখতে হবে না, কারণ বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় তাকে ধরা হয় নাঙ্গ]

উত্তর — ৫৩

১) মধ্যযুগেও আখ্যান বা গল্প ছিল, কিন্তু তা ছিল প্রধানত দেবদেবীর কাহিনী, উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্পঙ্গ মানুষের গল্প বলেই উপন্যাসে অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বিশেস থাকে না, মধ্যযুগে দেবদেবীর গল্প শোনার হতো বলে অবিশ্বাস্য মাহাত্ম্য কথাও থাকতো অনেক বেশি, নইলে তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতার বিশ্বাস জন্মায় না সাধারণ মানুষেরঙ্গ

২) উপন্যাস সৃষ্টির দুটি মৌলিক শর্ত হল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারঙ্গ

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সারাংশেও তার উল্লেখ আছেঙ্গ আপনারা বিশদভাবেই আলোচনা করতে পারেন এই প্রশ্নে কত মানাঙ্ক দেওয়া আছে তার ওপর নির্ভর করেঙ্গ সাংরাশের মূল সূত্রগুলি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—

ক) উপন্যাসের কাহিনী হবে মানুষের ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্নঙ্গ

খ) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ওপর উপন্যাস সৃষ্টি নির্ভরশীলঙ্গ

গ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষণঙ্গ

ঘ) ছাপাখানার আবিষ্কার উপন্যাস সৃষ্টির এক প্রধান শর্তঙ্গ

ঙ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভা। থাকা দরকারঙ্গ

৪) ক) সত্য

খ) অসত্যঙ্গ ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা সেই কাহিনীতে যথেষ্ট মানবিক আবেদন বা মানুষের ভালো লাগার মত উপাদান না থাকলে তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয় নাঙ্গ

গ) সত্যঙ্গ

ঘ) অসত্যঙ্গ কারণ, রোমান্স তো উপন্যাসেরই একটি প্রকারভেদ এবং উপন্যাসের প্রধান গুণ— বাস্তবতা; কাজেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলে তাকে কখনই আমরা 'উপন্যাস' বলতে পারবো না, আর যাকে 'উপন্যাস' বলা চলে না তাকে 'রোমান্স' বলার কোন কারণ নেইঙ্গ

৫) এই শ্রেণীবিভাগ আমরা করেই দিয়েছি, আপনি ৫৩.৪.২ অংশটি দেখে নিয়ে অনায়াসে উত্তর করার চেষ্টা করতে পারেনঙ্গ আপনার নিজের যদি অন্যরকম কোন সিদ্ধান্ত হয়, আপনি তাও জানাতে পারেনঙ্গ

৬) হ্যাঁ, হয়েছিলঙ্গ প্রথম গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে, নাম 'নববাবু-বিলাস'ঙ্গ দ্বিতীয় নভেল লেখার চেষ্টা হয়েছিল ১৮৫৮ সালে, গ্রন্থের নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'ঙ্গ তৃতীয় গ্রন্থটি রচিত হয় ১৮৫২ সালে, নাম 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ'ঙ্গ হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামে আরো একটি গ্রন্থ রচিত হয়, সেটির প্রকাশকাল ১৮৬২ সালঙ্গ

৭) হ্যাঁ, 'ঐতিহাসিক রোমান্স' লেখার চেষ্টা করা হয়েছিলঙ্গ লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'ঙ্গ পূর্ণা। রোমান্স হলে তাকে হয়তো 'উপন্যাস' বলা চলতো, কিন্তু গ্রন্থটি আসলে দুটি ক্ষুদ্র কাহিনীর সংকলনঙ্গ তাই একে 'উপন্যাস' না বলাই বাঞ্ছনীয়ঙ্গ

৮) সঠিক সাজানো এইরকম হবে ঃ

প্রকৃত নাম	**ছদ্মনাম**	**গ্রন্থনাম**
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নক্সা
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রমথনাথ শর্মা	নববাবু বিলাস

উত্তর — ৫৪.৩

১) কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়ায় বদলি হয়েছিলেন, এক কাপালিকের দেখা পেতেন মাঝরাতেঙ্গ এঁকে দেখেই সম্ভবত মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছিল, কোন নারী যদি লোকালয়ের সে। সম্পর্ক বর্জিত অবস্থায় বড় হয়, তবে যৌবনে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলে তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে কিনাঙ্গ এর উত্তর সন্ধানের জন্যই যে উপন্যাসটি লেখা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-প্রস।' গ্রন্থে সেই কথাই বলা হয়েছেঙ্গ

২) এই প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিতে পারবেনঙ্গ এই এককের ৫৪.৪ এবং ৫৪.৪.১ অংশদুটিকে সংক্ষেপে লিখলেই এর উত্তর হয়ে যাবেঙ্গ

৩) এর উত্তরও নিজে লেখার চেষ্টা করুনঙ্গ ৫৪.৪.২ অংশে এর উত্তর সাজানোই আছেঙ্গ

৪) ক) মৃণ্ময়ীঙ্গ

খ) সবগুলিইঙ্গ

গ) ঠিক জানা যায় নাঙ্গ

[ভেসে যাওয়ার কথা আছে, মৃত্যুর কথা নেই]

ঘ) দুজনেই

[এটা একটা শক্ত প্রশ্ন, কারণ যে-কোন উত্তরই ঠিক, তবে শেষেরটা যে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর, আপনারা একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবেন]

উত্তর — ৫৪.৫

১) কাহিনী বলতে বোঝায় উপন্যাসের আখ্যান বা গল্পটা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'story' এবং বৃত্ত বলতে বোঝায় সেই গল্পের বিন্যাস, যাকে ইংরেজিতে বলি আমরা 'প্লট'ঙ্গ কাহিনীর মধ্যে কেবল পাঠকের কৌহূহলবৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয়, অর্থাৎ তারপর কী হল, তারপর? এইভাবে কাহিনী এগিয়ে যায়ঙ্গ বৃত্তে থাকতে হবে সেই সঙ্গে। কার্যকারণের শৃঙ্খলা—এইজন্যে এটা হল, এই জন্যে ওটা হল, এইরকমঙ্গ এক কথায় বলা যেতে পারে, বৃত্ত একটা সুশৃঙ্খল কাহিনীঙ্গ

২) সাধারণভাবে বৃত্ত হয় তিন রকমেরঙ্গ এদের নাম হল 'সরল বৃত্ত', যাতে একটাই গল্প থাকে; 'জটিল বৃত্ত', যাতে একটি মূল কাহিনী আর এক বা একাধিক উপকাহিনী; 'যৌগিক বৃত্ত',—যেখানে বেশ কয়েকটা আপাত স্বাধীন কাহিনী যারা তাৎপর্যে কিন্তু একটা অভিন্ন সংবেদন তৈরি করেঙ্গ

৩) ক) না

খ) না

গ) হ্যাঁঙ্গ

উত্তর — ৫৪.৭

১) প্রথমত এটি যখন বঙ্কিমচন্দ্র রচিত একটি উপন্যাস তখন বাস্তবতা সৃষ্টি তো করতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস হিসাবে আমরা মেনে নেব কেনঙ্গ

দ্বিতীয়ত, কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দরকার ছিলঙ্গ

২) ক) সম্রাট আকবরঙ্গ

খ) মানসিংহের ভগিনীঙ্গ নাম উল্লেখ করা হয় নিঙ্গ

গ) মেহের-উন্নিসাঙ্গ

ঘ) ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেলিম তাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসে তার উল্লেখ নেই এই জন্য যে, উপন্যাসের সময়কালের মধ্যে তা পড়ে না

৩) ক) মোট একত্রিশটিঙ্গ

খ) Comedy of Errors; King Lear; Romeo and Juliet; Macbeth; Hamlet; Othello

গ) কালিদাস — রঘুবংশম্; অভিজ্ঞান শকুন্তলম্; মেঘদূতম্; কুমারসম্ভব;

শ্রীহর্ষ — রত্নাবলীঙ্গ

কবীন্দ্র ভট্টাচার্য — উদ্ধবদূতঙ্গ

ঘ) মধুসূদন দত্ত — মেঘনাদবধ কাব্য; বীরা।না কাব্য; ব্রজা।না কাব্যঙ্গ

দীনবন্ধু মিত্র — নবীন তপস্বিনী

বিদ্যাপতি — বৈষ্ণব পদঙ্গ

ঙ) Lord Byron — Don Juan; Manfredঙ্গ

John keats — Ode to a Nightingaleঙ্গ

William Wordsworth — Laodamiaঙ্গ

উত্তর — ৫৪.৯

১) উপন্যাসের কাহিনী কিছু পাত্র-পাত্রীর সাহায্যেই বর্ণনা করা হয়ঙ্গ এই সব পাত্র-পাত্রীকেই সাধারণভাবে বলা হয় চরিত্রঙ্গ তবে সৃষ্টির গুণে এই কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যদি রক্তমাংসের মানুষের মত সজীব না হয়ে ওঠে, তবে তাদের চরিত্র বলা যাবে নাঙ্গ প্রত্যেকটি মানুষের যেমন এক-একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, চরিত্রেরও তাই থাকা উচিতঙ্গ কিন্তু সেই সে। তাদের হাতে হবে দোষেগুণে ভরা মানুষঙ্গ এই ভাবেই চরিত্র আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেঙ্গ চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য না হলে কাহিনীটিও অবাস্তব মনে হবে, আর কাহিনী অবাস্তব হলে তাকে আমরা উপন্যাসই বলতে পারবো নাঙ্গ কাজেই উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির একটা বিরাট গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনি কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যাতে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে, সেটা দেখাও সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্বঙ্গ

২) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র বলতে একটিই আছে, নবকুমারঙ্গ উল্লেখ করা যায় এমন চরিত্র আছে আর দুটি—কাপালিক ও অধিকারীঙ্গ এই দুটি চরিত্রই সম্পূর্ণ একমুখী, কাপালিকের সব কিছুই খারাপ এবং অধিকারীর সব কিছুই ভালোঙ্গ সেইজন্য তাদের খুব বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র বলে মনেই হয় নাঙ্গ নবকুমারের চরিত্রে গুণ অনেক বেশি থাকলেও দোষও আছে কিছুঙ্গ তা না হলে কপালকুণ্ডলাকে সে অবিশ্বাসিনী ভাবতে পারতো না, কাপালিকের আজ্ঞা পালন করে কপালকুণ্ডলাকে বধের জন্য নিয়ে যেতে পারতো না — অন্তত এ কথা তার মনে পড়তো, এই কপালকুণ্ডলাই কাপালিকের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নতুন জীবন দান করেছিলেনঙ্গ দোষেগুণে ভরা এই চরিত্রটিই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র

হতে পেরেছেঙ্গ

৩) এটা বলা একটু শক্ত, কোন সন্দেহ নেইঙ্গ কারণ উপন্যাসের নাম 'কপালকুণ্ডলা'ঙ্গ এই চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা, একে সাহিত্যে রূপ দেবার জন্যই তিনি উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেনঙ্গ পক্ষান্তরে মতিবিবিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, কপালকুণ্ডলা যাতে কোন মতেই সুখী হতে না পারে, সে ব্যাপারে নিশ্চত হবার জন্য নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী হিসাবে তার পরিকল্পনা করেছেনঙ্গ কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যময়ী করে তুলেছেন, যেন একটা অলৌকিক পরিমণ্ডল তাকে ঘিরে আছে, তার উদাসী মূর্তির যেন সবটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় নাঙ্গ অন্যদিকে মতিবিবি স্বৈরিণী নারী—ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং লুব্ধ পুরুষের বিলাসসঙ্গিনী হবার জন্যই তাকে যেন বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেনঙ্গ অথচ এই নারীই আমাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেঙ্গ আসলে মতিবিবির মধ্যে দোষের ভাগ বেশি, কিন্তু সে এক চিরন্তন নারী, এইজন্য তাকে বেশি ভালো লাগেঙ্গ কপালকুণ্ডলার মধ্যে যেন এক অনির্বচনীয় মহত্ত্ব আছে, কিন্তু সে আমাদের হৃদয়ের অতো কাছে আসতে পারে নাঙ্গ

৪) ক) √

খ) ×

গ) ×

ঘ) ×

ঙ) √

চ) ×

উত্তর — ৫৪.১১

১) নামকরণ যখন বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তখন কপালকুণ্ডলা নামটিও তিনি নিজেই ভেবে থাকতে পারেনঙ্গ কিন্তু নামকরণ একটি অদ্ভুত ধরনের বলেই এ প্রশ্ন উঠেছে যে এরকম নাম তিনি আগে কখনও শুনেছেন কিনাঙ্গ এ বিষয়ে বলা যায়, ভবভূতির লেখা সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধবে' একটি কাপালিক ছিল, তার প্রধান শিষ্যার নাম ছিল কপালকুণ্ডলাঙ্গ কিন্তু সে চরিত্রটি ছিল নির্দয় এবং হিংস্রঙ্গ কাজেই, নামটি যদিওবা বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করে থাকেন ভবভূতির নাটক থেকে, চরিত্রটি তিনি নির্মাণ করেছেন নিজের মত করেইঙ্গ

২) সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ আছে — কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতিঙ্গ একটি গ্রন্থকে ঠিক কী ধরনের বা প্রকারের সাহিত্য বলা যায়, সেটা নির্ণয় করাকেই বলে তার শ্রেণীবিচারঙ্গ কারণ অনেক সময় আকৃতির দিক থেকে একরকম মনে হলেও তার প্রকৃতি হয়তো দেখা যায় অন্যরকমঙ্গ সেক্ষেত্রে প্রকৃতিগত বিচারটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিতঙ্গ

কপালকুণ্ডলা দৃশ্যত একটি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবেই এটি রচনা করেছেন কিন্তু অনেকেই এর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক রকম কথা বলেছেনঙ্গ কেউ একে বিশুদ্ধ 'কাব্য' বলতে চেয়েছেন, কেউ বলেছেন 'নাটক', কেউ আবার এমন কথাও বলেছেন যে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিচিত্র সৃষ্টিঙ্গ আর ডাব্লিউ ফ্রেজার সাহেব মন্তব্য করেছিলেন 'লতির বিয়ে', ছাড়া এমন একখানা বই নাকি পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যেও কোথাও খুঁজে

পাওয়া যাবে নাঙ্গ আমরা এই সমস্যার সমাধানে কীভাবে অগ্রসর হবো সেটা এই ৫৪.১১ এককে বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা আছে, আপনারা সেই আলোচনা পড়ে নিজের বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেনঙ্গ মনে রাখবেন, সাহিত্যের প্রশ্নে একেবারে আমিই চূড়ান্ত সত্য কথা বলছি, এভাবে কেউ বলতে পারে নাঙ্গ সুতরাং আপনার নিজের চিন্তাভাবনার সুযোগ নিশ্চয়ই আছে, তবে তা করতে হবে আপনি যেসব আলোচনা পড়েছেন, তাকেই অবলম্বন করেঙ্গ কারণ আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্যই আলোচনাগুলি বিভিন্ন দিক থেকে করা হয়েছেঙ্গ

৫৪.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনা নির্ভর উত্তরমালা

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে একটা কথা আপনাদের জানানো দরকারঙ্গ সেটি হল, যে প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে তার প্রত্যেকটিই যাতে আপনি নিজে আলোচনা করতে পারেন, সেই ভাবেই আলোচনা করা হয়েছেঙ্গ কাজেই এটা বলে দেওয়াই যথেষ্ট হতো যে, এই প্রশ্নের জন্য এই এককটি দেখে নিন এবং তারপর আপনার বুদ্ধি বিবেচনামতে ঠিক মত গ্রহণ করুণ, কিন্তু বর্জন করুন, কিছু আপনি নিজে ভেবে-চিন্তে নিনঙ্গ কারণ আমাদের আলোচনা একক বিভাগ করে পৃথক বিষয় নিয়েই হয়েছেঙ্গ বিষয় অনুযায়ী এককের বিভাগ এইরকম ঃ

৫২	লেখক, তাঁর সৃষ্টি এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
৫৩	উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণ এবং তার শ্রেণীবিভাগঙ্গ
৫৩	উপন্যাসের পথিকৃৎ কে এবং তাঁর সমসাময়িক রচনাঙ্গ
৫৪.৩ ও ৫৪.৪	‘কপালকুণ্ডলা’র কাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যঙ্গ
৫৪.৫ ও ৫৪.৬	‘কপালকুণ্ডলা’র বিষয়বিন্যাস বা বৃত্তগঠনের আলোচনাঙ্গ
৫৪.৭	‘কপালকুণ্ডলায়’ বাস্তবতা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়ঙ্গ
৫৪.৯	‘কপালকুণ্ডলায়’ চরিত্রসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যঙ্গ
৫৪.১১	‘কপালকুণ্ডলায়’ শ্রেণীনির্ণয়ঙ্গ

তবুও আপনাদের সম্পূর্ণ একার প্রচেষ্টায় উত্তর লেখার অসুবিধাও কিছু আছেঙ্গ প্রধান অসুবিধা হল এই যে, উত্তরগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখতে হবে—৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যেঙ্গ কিন্তু আমাদের আলোচনা তুলনায় কিছুটা বিস্তৃতঙ্গ সেই আলোচনা দেখে কী করে সংক্ষেপ করবেন তা বোঝাবার জন্য কিছু উত্তর এখানে লিখে দেওয়া হবেঙ্গ তবে তা সত্ত্বেও সেই উত্তর হুবহু না লিখে আপনি নিজে কিছু ভাবুন, আলোচনা-অংশ দেখুন, তার কিছু পরিবর্তন করুন—এটাই বাঞ্ছনীয়ঙ্গ আপনাদের সুবিধার জন্য যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হল, সেগুলি অনুগ্রহ করে মনে রাখবেনঙ্গ

এবার উত্তরমালাঙ্গ

১) এই প্রশ্নের উত্তর আপনি অনায়াসে ৫৪.১১ অংশ থেকে করতে পারবেনঙ্গ শুধু মনে রাখবেন, এই মূল কথাগুলি আপনাকে লিখতে হবে—

ক) কাব্যের গভীর অনুভূতি বর্তমানঙ্গ

খ) উপন্যাসের মত স্পষ্ট নয়, রহস্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টিঙ্গ

গ) ভাষা একেবারেই কাব্যময়ঙ্গ

ঘ) কিছু উক্তিতে কাব্যিক ব্যঞ্জনা আছেঙ্গ

ঙ) কিন্তু আখ্যান চরিত্রবিত্রণ ও বিশেষ করে বৃত্তনির্মাণের বৈশিষ্ট্যে বোঝা যায় এটি কাব্য নয়ঙ্গ

২) এই প্রশ্নের উত্তর ১ নং প্রশ্নের উত্তরের মতই হবে, শুধু নাট্য লক্ষণ বলতে কী বোঝায়, এবং সেটা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে কিনা আপনাদের বলতে হবেঙ্গ তাই সেই লক্ষণ দু-এক কথায় জেনে নিতে পারেন ঃ

প্রকৃতির দিক থেকে দ্বন্দ্বময়তা এবং বাহ্যিক দিক থেকে চমকিত ঘটনা সংস্থাপন নাটকের বৈশিষ্ট্যঙ্গ কপালকুণ্ডলায় দ্বন্দ্বময়তা আমরা খুব বেশি দেখতে পাইনা, কারণ কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব নেইঙ্গ মতিবিবির যদি আগ্রার রাজসিংহাসন দখলের ক্ষমতা থাকতো তাহলে তার ফিরে আসা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারতো, কিন্তু সে সম্ভাবনাও কিছু ছিল নাঙ্গ নবকুমার বিক্ষুব্ধ চরিত্র—একেবারে শেষের দিকে কিছুটা দ্বন্দ্বময় বলা যায়ঙ্গ আসলে চমকপূর্ণ ঘটনা এখানে অনেক ঘটেছে যাদের 'নাটকীয়' ঘটনা বলতে পারি, যেমন —সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ, দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবির সে। আকস্মিক সাক্ষাৎ, কপালকুণ্ডলার পত্র হারানো এবং তা নবকুমারের হাতে পড়া, ব্রাহ্মণ-বেশী মতিবিবির অ্রীয় দান দেখে নবকুমারের কপালকুণ্ডলাকে ভুল বোঝা ইত্যাদিঙ্গ

৩) [লক্ষ করে দেখুন, এখানে কপালকুণ্ডলা যে উপন্যাস, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি, কী জাতীয় উপন্যাস, সে কথাই জানতে চাওয়া হয়েছেঙ্গ] উত্তর এই ভাবে লিখতে পারেন?

উপন্যাসের প্রধানত দুটি বিভাগ—'নভেল' এবং 'রোমান্স'ঙ্গ 'নভেল' আমরা পাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ এবং পরিচিত পাত্রপাত্রী, 'রোমান্সে' বাস্তবতা বজায় রেখে, আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে যে জগৎ সেখানকার মানবিক কাহিনী শোনানো হয়ঙ্গ 'রোমান্সের' কাহিনী ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলে তাকে বলে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং লেখকের কল্পনার যদি সেটি আগেই এসে থাকে তবে তাকে বলে 'কাব্যিক রোমান্স'ঙ্গ

'কপালকুণ্ডলা'র সমগ্র কাহিনী আমাদের স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে এদের আমরা পেতে পারি না, সুতরাং এটি যে 'রোমান্স' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেইঙ্গ ইতিহাসের আশ্রয় এ উপন্যাসে নেওয়া হলেও মূল কাহিনীর সে। ইতিহাসের যোগ নেই বলে একে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' বলা যায় নাঙ্গ বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসের সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতে আগেই দেখা দিয়েছিল —যৌবনকাল পর্যন্ত লোকালয়বর্জিত স্থানে বাস করে, পরে দাম্পতয জীবনে বাস করলে কোন নারীর স্বাভাবিক সংসারাসক্তি, প্রেম ইত্যাদি অনুভূতি জাগবে কিনাঙ্গ এই চিন্তারই বাস্তব গ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ঔপন্যাসিক রূপান্তর বলা যায় এই উপন্যাসকেঙ্গ কাজেই এটি যে একটি 'কাব্যিক রোমান্স' এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়ঙ্গ

৪) বুঝতেই পারছেন এর উত্তর পাওয়া যাবে ৫৪.৪ নং এককে কারণ এটি কাহিনী সংক্রান্ত প্রশ্নঙ্গ এই এককের ৫৪.৪.১ ও ৫৪.৪.২ অংশ দেখে উত্তরটি সংক্ষেপে লিখতে পারেন অথবা ৫৪.৪.২ অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি সরাসরি লিখে দিতে পারেনঙ্গ

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের পরিচয় কিছু কিছু আমরা পাইঙ্গ সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ কাপালিক ও তার পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে এরকম রহস্যময় আবেষ্টনী একটা থাকতেই পারেঙ্গ সেগুলির পরিচয় দিই আগেঙ্গ

অলৌকিক যে অংশটি আছে সেটি রয়েছে চতুর্থ খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদেঙ্গ মতিবিবির সে। সাক্ষাৎ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কপালকুণ্ডলা ভৈরবী-কালীর দর্শন পেয়েছে এবং তাঁর নির্দেশ শুনতে পেয়েছেঙ্গ এটি যে প্রত্যক্ষ, সেটা দেখাবার জন্য Wordsworth-এর একটি কাব্যপংক্তি দিয়ে পরিচ্ছেদের শুরু — 'No spectre greets me — no vain shadow this,' কপালকুণ্ডলা দেখেছে 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তিঙ্গ গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতশ্রুতি হইতেছে, কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে — বাম করে নরকপাল — অে। রুধিরধারা ললাটে বিষমোজ্জ্বলাজ্বালা বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিতঙ্গ' কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি স্বপ্ন দেখেছে, তাকেও অতিপ্রাকৃত বলা যেতে পারে, কারণ সেখানে কপালকুণ্ডলার পরিণতিই যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছেঙ্গ যে তরীতে কপালকুণ্ডলা ইতোপূর্বে বসন্তলীলা করেছে, সেই তরী সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবার জনয এসেছে কাপালিক, ব্রাহ্মণ বেশধারী একজন তাকে আটকেছে, তরী রাখবে না ডুবিয়ে দেবে প্রশ্ন করায় তরী নিজেই তা ডুবিয়ে দিতে বলেছে এবং তরী পাতালে প্রবেশ করেছেঙ্গ

সংস্কারের যে ব্যাপারটি আছে সেটি, বিবাহের পর যাত্রাকালে ভবানীর চরণ থেকে বিল্বপত্র খসে পড়াঙ্গ এটি কপালকুণ্ডলাকে পরবর্তী জীবনে সর্বদা আশঙ্কিত রেখেছেঙ্গ

উপন্যাস আধুনিক সাহিত্য হলেও কপালকুণ্ডলা একটু ান্য ধরনের উপন্যাসঙ্গ এখানে কিছু রহস্যময়তাকে আমরা ছাড়পত্র দিতে পারিঙ্গ দ্বিতীয়ত এই ধরনের অলৌকিক বা অতি প্রাকৃত যে মনের ভুল হতে পারে, তারও ইি তি বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেনঙ্গ ভৈরবী-মূর্তি দর্শনের আগে এ কথা বলেছেন মানুষের মন চঞ্চল হলে 'অনৈসর্গিক পদার্থও প্রতীক্ষীভূত' বলে বোধ হতে পারেঙ্গ স্বপ্নদর্শন যে কপালকুণ্ডলার অবচেতন মনেরই প্রতিফলন এ আমরা বুঝিঙ্গ আর সংশয় উপস্থিত হলে সংস্কার তো মানুষকে আচ্ছন্ন করেইঙ্গ কাজেই কপালকুণ্ডলায় অতিপ্রাকৃত উপাদান বলে যেগুলিকে মনে হয় তাদের প্রত্যেককেই জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বলে অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়ঙ্গ

৬) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটির সে। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা যুক্ত করে রেখেছেন অন্ধকার এবং কপালকুণ্ডলার কেশভার — অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিতঙ্গ যখন প্রথম তাকে নবকুমার দেখে, তখনও তাই এবং একেবারে শেষ পরিচ্ছেদ, যেখানে কপালকুণ্ডলাকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেও তাই 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইলঙ্গ বিল্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইলঙ্গ' এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অন্ধকারই কপালকুণ্ডলার সঠিক প্রেক্ষিত হয়েছে, শ্যামাসুন্দরী ওষধিচয়নের ক্ষেত্রেও বলেছে, 'ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়ঙ্গ'

চরিত্রটিতে এভাবে অন্ধকারে রাখার গূঢ় তাৎপর্য আছে বলেই আমরা মনে করিঙ্গ কপালকুণ্ডলা কেবল যে বঙ্কিমচন্দ্রে কাল্পনিক সৃষ্টি তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় 'অর্ধেক কল্পনা তুমি, অর্ধেক মাধবীঙ্গ' কপালকুণ্ডলা লেখকের একটি অর্ধস্ফুট তত্ত্বপত্র — সম্ভবত লেখকের কাছেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়ঙ্গ সেইজন্য একটি রহসের মায়াজালে চরিত্রটিকে বরাবর তিনি রেখে দিতে চেয়েছিলেনঙ্গ দিনের উজ্জ্বল আলোয় এনে ফেললে সে রহস্যজাল উন্মুক্ত হয়ে যায় বলেই প্রকাশ্য দিবালোকে চরিত্রটিকে তিনি কখনও আনেননিঙ্গ

৭) প্রশ্ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি কপালকুণ্ডলার কাহিনী সংক্রান্ত প্রশ্নঙ্গ আপনারা জানেন এটা আমরা আলোচনা করেছি ৫৪ নং এককেঙ্গ সুতরাং সেখানেই এর উত্তর আছেঙ্গ আপনরা ৫৪.৩ শীর্ষাঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদটি একটু সংক্ষেপে ১০০ শব্দের মধ্যে লেখার চেষ্টা করলেই এর উত্তর হয়ে যাবেঙ্গ

৮) [এই প্রশ্নের উত্তর আপনি সমস্ত আলোচনা পড়ে ঠিক যেরকম আপনার মনে হয়, সেইভাবেই দিতে চেষ্টা করবেনঙ্গ আমার মতামত আমি উত্তরের মত লিখছি, এটি যুক্তিসংগত বিবেচনা করলে আপনি এটাও ব্যবহার করতে পারেনঙ্গ]

যে নারীর লোকালয়ের সে। কোনরকম সম্পর্ক না রেখে বড় হয়েছে, যৌবনে বিবাহ হলে সংসার ও দাম্পত্য জীবনকে সে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে পারবে কিনা এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসাঙ্গ এ বিষয়ে অনেক মতামত পেলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যা সংগত মনে করেছেন সেই মত অনুযায়ীই উপন্যাসে চরিত্রটির পরিণতি দেখিয়েছেনঙ্গ তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া মেয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সুখী হয়নি, দাম্পত্য জীবন কাকে বলে সে বোধও তার হয়নিঙ্গ এমনিতে সংসার সম্পর্কে উদাসীন সে ছিলই, তার ওপর মতিবিবির কথা জানতে পেরে সংসারে থাকার ইচ্ছা তার একেবারেই লোপ পেয়ে যায় এবং পরে নাটকীয় পরিস্থিতিতে নবকুমার তাকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটনায় দুজনেই সমুদ্রে তলিয়ে যায়ঙ্গ

এই পরিরতি স্বাভাবিক মনে করা শক্ত, কারণ মতিবিবি এসে আবির্ভূত হলে পরিস্থিতি কী রকম দাঁড়াতো সেটা পরের কথা, কিন্তু এক বছরের বেশি সময় নবকুমারের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে সপ্তগ্রামে কাটাবার পরও সংসারে কোনরকম আসক্তি না জন্মানো খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপারঙ্গ দাম্পত্য জীবন এবং যৌন জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন, তবে তাদের কোন সন্তান সম্ভাবনা ঘটেনি, এটাও আমরা দেখেছিঙ্গ কপালকুণ্ডলা লোকালয়ে না থেকেও নারীসুলভ করণাবৃত্তি যখন অর্জন করেছে তখন জৈব আকর্ষণ তার কেন গড়ে উঠবেনা বোঝা শক্তঙ্গ তাই সংসার তার উৎসাহ জন্মানোটাই স্বাভাবিক ছিল, এরপর মতিবিবির প্রসে। কোন নাটকীয় সিদ্ধান্তে লেখক নিলে সম্ভবত তা আমাদের আপত্তির কারণ হতো নাঙ্গ

৯) গ্রন্থের নাম 'কপালকুণ্ডলা' বলেই তাকে নায়িকা হিসাবে মেনে নিতে পারলে খুব ভাল হতোঙ্গ বিশেষ করে মতিবিবি যখন কোনমতেই আদর্শনারী নয়, এমন একটি স্বৈরিণী নারীকে নায়িকার সম্মান দিলে অনেকেরই তা ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষনীয়া নারী চরিত্র মতিবিবিইঙ্গ

কপালকুণ্ডলার নাটকীয় আবির্ভাব, তার বন্য সৌন্দর্য, তার রহস্যময় চরিত্র আমাদের বিহ্বল করে সত্য,

কিন্তু তাকে যেন আমরা ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে করে নিতে পারিনা — ঠিক যেমন পারেনি নবকুমার, পারে নি শ্যামাসুন্দরীঙ্গ মতিবিবিকে ঘরের মেয়ে বা আপনজন ভাবা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তাকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় নাঙ্গ আগ্রায় যে জীবনযাত্রায় সে জড়িয়ে পড়েছিল সেটা অনভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়ঙ্গ পাঠানের হাতে লুণ্ঠিতা হয়ে যে মেয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয় তাকে নবকুমার গ্রহণ করে নি সামাজিক বিধিনিষেধের জন্যই, কিন্তু আধুনিক পাঠক হিসাবে একথা আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করি যে তাতে মতিবিবির নিজের দোষ কিছু ছিল নাঙ্গ এরপর ক্ষমতালোভী, বিবেকবর্জিত পিতার হাতে পড়ে যা হতে হয়েছে তাকে, তাতেও নিজের কোন হাত ছিল না তারঙ্গ আগ্রার ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকতে না পেরে এবং অবশ্যই সুপ্ত দাম্পত্যপ্রেম মনে জাগ্রত হওয়ায় যে স্ত্রীলোক সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে, তার আচরণকে আমরা নিন্দা করতে পারি, কিন্তু তার অধিকারবোধকে অস্বীকার করতে পারিনাঙ্গ

তাই জীবনে অভাবিত সুযোগ পেয়ে গিয়েও যে তার অধিকারকে কোনদিন বুঝতেই শিখল না, তার বদলে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক নারীর অধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামকে — হোক না তা অসুন্দর উপায়ে, আমাদের মনে মনে সমর্থন না করে কোন উপায়ই থাকে নাঙ্গ মতিবিবি অবশ্যই উজ্জ্বলতর চরিত্রঙ্গ

১০) চরিত্র আমরা আলোচনা করেছি ৩৭.৯ নং এককেঙ্গ তাই সেখানে ৩৭.৯.৪ শীর্ষক আলোচনা সংক্ষেপে লিখতে পারেনঙ্গ আমরা বৃদ্ধের চরিত্র আলোচনা করিনি, পেষমনও না; আপনি সে বিষয়েও আপনার মতামত সংযোজিত করতে পারেনঙ্গ

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস তো আছেই, মুঘল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ই সেখানে ধরা পড়েছেঙ্গ তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি কারণে একে ঐতিহাসকি উপন্যাস' আমরা বলতে পারবো নাঙ্গ কারণগুলি উল্লেখ করলেই আমরা এরকম সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি তা বোঝা যাবেঙ্গ

ক) সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে এবং এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কেন উৎসাহিত হয়েছিলেন তা জানা থাকলে, আমরা বুঝতে পারি, মতিবিবির আগ্রার জীবনবৃত্তান্ত নয়, নির্জন সমুদ্রতীরে কাপালিকের লালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলাই এই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক কারণ এবং প্রধান আকর্ষণের বস্তুঙ্গ সেই হিসাবে একে কাব্যিক রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর সংগতঙ্গ

খ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস থেকেই চরিত্র সংগৃহীত হয়, কিছু কাল্পনিক চরিত্রও থাকতে পারেঙ্গ এই উপন্যাসের সে। ইতিহাসের যোগাযোগ যেটুকু সেখানে মতিবিবি বা নবকুমার কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়ঙ্গ ঐতিহাসিক যেসব চরিত্র অতি স্বল্পকালের জন্য উপন্যাসে এসেছে তাদের চরিত্র নির্মাণে কোন উৎসাহ লেখকের ছিল নাঙ্গ

গ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটা ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করতে হয়, এখানে যে পটভূমির প্রতি লেখকের উৎসাহ বেশি তাকে ভৌগোলিক বলা যায়, ঐতিহাসিক নয়ঙ্গ

ঘ) সমগ্র উপন্যাসের এক-চতুর্থাংশ মাত্র, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত, মতিবিবিকে আশ্রয় করেই ইতিহাস এই উপন্যাসে কিছুটা স্থান পেয়েছে — সেই চরিত্রটিও উপকাহিনীর অন্তর্গতঙ্গ সুতরাং ইতিহাসের প্রেক্ষিত এই উপন্যাসে থাকলেও একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা কখনই সংগত নয়ঙ্গ

একক ৩৮ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'স্ত্রীর পত্র'

গঠন

৩৮.১ উদ্দেশ্য
৩৮.২ প্রস্তাবনা
৩৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প
৩৮.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র
৩৮.৫ সারাংশ
৩৮.৬ প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ
৩৮.৭ অনুশীলনী
৩৮.৮ উত্তর সংকেত
৩৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৮.১ উদ্দেশ্য

প্রথম একক পাঠ করে আপনি গল্প ও ছোটগল্পের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে জেনেছেনঙ্গ সেই সঙ্গে জেনেছেন ছোটগল্পের সাধারণ লক্ষণগুলিঙ্গ বর্তমান এককটিতে আপনি 'রবীন্দ্র' গল্প সাহিত্যের একটি স্মরণীয় রচনার সঙ্গে পরিচিত হবেনঙ্গ এই গল্পটির মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের, জীবন-ভাবনার এক অনন্য পরিচয় পাবেনঙ্গ সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলনের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজে নারীর লাঞ্ছনার অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেনঙ্গ গল্পের প্রধান চরিত্র অবলম্বনে তিনি নারীর নারীত্ব, তাঁর মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে তুলে ধরেছেনঙ্গ রবীন্দ্র ছোটগল্পের সংসারে এরকম আরও কয়েকটি গল্প আছে, যার নায়িকারা বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা ও চৈতন্যে সমকালকে অতিক্রম করে কালাতীত মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেঙ্গ

এককের মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে আপনি যে জ্ঞান আহরণ করবেন, তার সাহায্যে আপনার—

- রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য গল্পের সঙ্গে পরিচয় হবেঙ্গ
- গল্পটির মাধ্যমে রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করবেনঙ্গ
- উপলব্ধি করতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের যুগাতিশায়ী মনন ও মনীষার পরিচয়ঙ্গ
- চিঠির আকারে লেখা এই রচনাটির মাধ্যমে আপনার পরিচয় হবে গল্প-রচনার এক নতুন আঙ্গিকের সঙ্গেঙ্গ

৩৮.২ প্রস্তাবনা

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ঙ্গ পত্রিকাটি মনন, বিষয় ভাবনা, উপস্থাপনা ও ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে নতুন বার্তা বয়ে এনেছিলঙ্গ এ পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পূর্ববর্তী 'হিতবাদী', 'সাধনা', ভারতী' যুগ থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্রঙ্গ এ সময়ের গল্পে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার সচেতন বিচার বিশ্লেষণ করেছেনঙ্গ নারীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা রবীন্দ্র মননকে আশ্রয় করেছেঙ্গ 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত অনেক গল্পে তাই দেখা যায় ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ থেকে নারীর ব্যক্তিত্বই তাঁর গল্পে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছেঙ্গ পুরুষ চরিত্র এখানে অবহেলিত না হলেও, নারী এ পর্বে অনেকটা দীপ্তিময়ী উজ্জ্বল এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছেঙ্গ প্রস।তঃ 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' স্মরণীয়ঙ্গ এসব গল্পে নারী যে শুধুই স্ত্রী নয়, তাঁরও একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা আছে — তা তুলে ধরা হয়েছেঙ্গ

'স্ত্রীর পত্র' পত্রাকারে লেখা 'ছোটগল্প'ঙ্গ বাংলা সাহিত্যে এই বিশেষ ধরনের আ।িকের ব্যবহার প্রথম দেখা যায় মধুসূদন দত্তের 'বীরা।না' কাব্যেঙ্গ ঐ কাব্যটি ওভিদের 'হেরোইদায়' কাব্য অনুসরণে রচিতঙ্গ বীরা।না-য় নায়িকারা দীপ্তিময়ী, তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানিয়েছেনঙ্গ 'সবুজ পত্রে' 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রকাশ ১৯১৪ঙ্গ অর্থাৎ ১৩২১ ব।ব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়ঙ্গ মূলগল্প পাঠের সময় বর্তমান আলোচনা গল্পের প্রতিপাদ্য বুঝতে সহায়ক হবেঙ্গ

৩৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেঙ্গ তাঁর কাব্য রচনার আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায় ১৮৭৫ — চতুর্দশ বর্ষীয় বালক হিন্দুমেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েঙ্গ ১৮৭৭-এও আর একটি কবিতা পড়েছিলেনঙ্গ এরপর নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ মনের সহজ অনুভবের একান্ততা থেকে জোরাসাঁকোর সীমাবদ্ধ জীবন থেকে যখনই বেরিয়েছেন, অনুভব করেছেন, পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষের স।ে একাত্মতা — ক্রমে দেশের সুবৃহৎ জনজীবনের বেদনাও তাঁর নিভৃত অন্তরে প্রবেশ লাভ করেছিলঙ্গ কিন্তু তখনও কবির গ্রাম-বাংলার স।ে গভীর নৈকট্য স্থাপিত হয়নিঙ্গ অন্তরের এই প্রাণ-পৈতি থেকে গ্রাম-জীবনঙ্গ সম্পর্কে আবাল্য আকর্ষণ অনুভব করেছেনঙ্গ এই সত্যকে স্বীকার করলেই রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন সূত্রকে অনুধাবন করা যাবেঙ্গ তাঁর ছোটগল্পে বস্তুত বাঙালি-জীবন মুখীনতাই প্রকাশ পেয়েছেঙ্গ 'ঘাটের কথা' (কার্ত্তিক, ১২৯১), রাজপথের কথা (১৩০০) ঠিক গল্প নয়ঙ্গ গল্পাভাস গল্পচিত্র বিশেষঙ্গ শেষোক্তটির কাহিনীর স্বপ্নতায় দার্শনিকতায় পর্যবসিত হয়েছেঙ্গ ফলত ছোটগল্প হয়ে ওঠেনিঙ্গ

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' পত্রিকায় পরপর ছটি ছোটগল্প লেখেনঙ্গ এখান থেকেই তাঁর যথার্থত ছোটগল্প লেখা শুরুঙ্গ এ সময় কবি শিলাইদা, পতিসর, নাটোর নানা জাগয়াগ নদীপথে ঘুরছেন — জমিদারী দেখার কাজেঙ্গ পদ্মা-বাস পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুললেনঙ্গ বাংলার গ্রাম যেন বস্তুঘন জীবনভূমিতে নেমে এলো বাংলা কথা সাহিত্যেঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বাদ্শা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি সামন্ত প্রভুরা আধা গ্রাম-শহর ছেড়ে অন্তর্হিত হলেন গ্রাম-বাংলা ও তার জনজীবন স্থান করে নিলঙ্গ বাংলা গল্পের পট পরিবর্তন হোলঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়ঙ্গ প্রথম পর্বের লেখাগুলি মূলত 'হিতবাদী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেঙ্গ পরের পর্বটি 'সাধনা' পত্রিকাকেন্দ্রিকঙ্গ তৃতীয় পর্যায়টিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সবুজপত্র'-এর যুগ; এবং শেষপর্বটি তাঁর জীবনের সায়াহ্নকালে আত্মপ্রকাশ করে, সমালোচক মহলে যার নাম 'তিনসী' পর্বঙ্গ এর বাইরে 'নবজীবন', 'ভারতী', 'বালক' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিলঙ্গ প্রথম তিনটি পর্বেকে অবলম্বন করে 'গল্পগুচ্ছ' তিনখণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালেঙ্গ চতুর্থ পর্বের লেখাগুলির সে। 'লিপিকা', 'গল্পসল্প' এবং 'সে' গ্রন্থের কাহিনীগুলিও একত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকেঙ্গ

১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশিত হয়ঙ্গ শেষ লেখাগুলি ১৯৪০ সালের 'গল্পসল্প' বইতে প্রাপ্যঙ্গ 'হিতবাদী' পর্বে তিনি মূলত গ্রামজীবনকে অবলম্বন করেই লেখেনঙ্গ 'সাধনা' পর্বে, তাঁর লেখায় তার সে। নগরজীবন প্রতিভাত হতে থাকেঙ্গ 'সবুজপত্র'-এর আমলে মনোবিশ্লেষণমূলক গল্প প্রচুরায়তভাবে রচিত হয়ঙ্গ এবং এই ধারাটিই পুনর্বিকশিত হয়ে শেষপর্বেঙ্গ

সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর গল্পে ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করেছেঙ্গ জবিদারী প্রথা, পণপ্রথা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক উপলব্ধির বহু বিচিত্রতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক টাপাপোড়েন, মনের অন্তর্বিলীন গহেনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা নানা কূটেষণা আপাত-অলৌকিকতা ইত্যাদি তাঁর লেখা গল্পগুলিতে ব্যাপক স্থান অধিকার করেছেঙ্গ তাঁর ছোটগল্পের শিল্পনির্মিতি এবং বিষয় গভীরতার জন্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের সে। তাঁকে নির্দ্বিধায় একাসনস্থিত করা যেতে পারেঙ্গ

৩৮.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু,

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নিঙ্গ চিরদিন কাছেই পড়ে আছি — মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখাবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নিঙ্গ

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাছেঙ্গ শামুকের সে। খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সে। তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সে। এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে নাঙ্গ বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেনঙ্গ

আমি তোমাদের মেজোবউঙ্গ আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সে। আমার অন্য সম্বন্ধও আছেঙ্গ তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজো বউয়ের চিঠি নয়ঙ্গ

তোমাদের সে। আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসে।ই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়িঙ্গ আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুমঙ্গ পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভঙ্গ

আমার মরণ নেইঙ্গ সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছিঙ্গ

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধ নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স

বারোঙ্গ দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকেঙ্গ স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়ঙ্গ সেদিন তোমাদের কী হয়রানিঙ্গ তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না — সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নিঙ্গ

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিলঙ্গ নইলে এত কষ্ট আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না — তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় নাঙ্গ

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেনঙ্গ শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবেঙ্গ মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দামঙ্গ তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়ে-মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে নাঙ্গ

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসলঙ্গ সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল — আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল নাঙ্গ

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল — তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুমঙ্গ আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটেঙ্গ সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেলঙ্গ কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবিঙ্গ রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গ।মৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেইঙ্গ

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নিঙ্গ কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছেঙ্গ ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছেঙ্গ মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাইঙ্গ যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেইঙ্গ কিন্তু কী করব বলোঙ্গ তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকেঙ্গ তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছঙ্গ কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুমঙ্গ

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নিঙ্গ আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুমঙ্গ সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখান তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নিঙ্গ সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমিঙ্গ আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নিঙ্গ

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘরঙ্গ অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের

আর নড়বার জায়গা নেইঙ্গ সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলাঙ্গ সকালে বেহারার নানা কাজ, উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিতঙ্গ আমার প্রাণ কাঁদতঙ্গ আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে — তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকলঙ্গ যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বুড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেনঙ্গ

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেলঙ্গ আমাকেও সে সে। যাবার সময় ডাক দিয়েছিলঙ্গ সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুমঙ্গ মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারেরঙ্গ মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম নাঙ্গ

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিলঙ্গ সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছেঙ্গ ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেইঙ্গ আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেইঙ্গ সেদিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করেঙ্গ কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়ঙ্গ ঠিক উল্‌টো — অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় নাঙ্গ আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় নাঙ্গ সেই জন্যে তার বেদনা নেইঙ্গ তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়ঙ্গ আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠেঙ্গ

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নিঙ্গ আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল নাঙ্গ জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধেঙ্গ সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উটে আসতুমঙ্গ বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়ঙ্গ কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কীঙ্গ মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজঙ্গ

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেলঙ্গ আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুমঙ্গ জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত নাঙ্গ কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়ঙ্গ আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তারপর থেকে ফাটল শুরু হলঙ্গ

বিধবা মার মৃত্যুর পর আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদঙ্গ আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো — দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালঙ্গ পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া সে কতবড়ো অপমানঙ্গ দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়ঙ্গ

তারপরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশাঙ্গ তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেনঙ্গ কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেনঙ্গ এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল নাঙ্গ তিনি পতিব্রতাঙ্গ

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠলঙ্গ দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হলঙ্গ তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছেঙ্গ ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সত্তাঙ্গ

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না — রূপও না, টাকাও নাঙ্গ আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জানঙ্গ তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেনঙ্গ সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেনঙ্গ

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছেঙ্গ আমি সলক দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নেঙ্গ আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় — তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছঙ্গ

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুমঙ্গ দিদি বললেন, ''মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেনঙ্গ'' আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেনঙ্গ কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেনঙ্গ এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়লঙ্গ তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হলঙ্গ আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিয়ে চেষ্টা করতেনঙ্গ কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত নাঙ্গ তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেঝেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হতঙ্গ কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিলঙ্গ

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এলঙ্গ যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব নাঙ্গ বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলতঙ্গ তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা

অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারেঙ্গ অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেইঙ্গ অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জোর নেইঙ্গ কিন্তু, তারা বেশ আছেঙ্গ

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগলঙ্গ তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হলঙ্গ আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুমঙ্গ

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়ঙ্গ কাজেই আমার কাজটি সহজ হল নাঙ্গ দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবেঙ্গ তোমরা বললে বসন্তঙ্গ কেননা, ও যে বিন্দুঙ্গ তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় নাঙ্গ কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কেঙ্গ বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জোর হলঙ্গ আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে নাঙ্গ এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেলঙ্গ তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেঙ্গ বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছেঙ্গ কেননা, ও যে বিন্দুঙ্গ

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলেঙ্গ ব্যামো হতেই চায় না — মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধঙ্গ রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল নাঙ্গ কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিনঙ্গ আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষমঙ্গ

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর এক গেরোয় ধরলঙ্গ আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলেঙ্গ ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নিঙ্গ বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যেঙ্গ আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি — এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটিঙ্গ আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত নাঙ্গ বলত, ''দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নিঙ্গ'' যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমানঙ্গ আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগতঙ্গ কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল নাঙ্গ কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাতঙ্গ মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠলঙ্গ

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেইঙ্গ উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছেঙ্গ যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটেঙ্গ আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে নাঙ্গ

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিলঙ্গ এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নিঙ্গ সেই আমার মুক্ত স্বরূপঙ্গ

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকলঙ্গ এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল নাঙ্গ যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল নাঙ্গ যখন স্বদেশী হা।মার লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে চরঙ্গ তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দুঙ্গ

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত — তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতঙ্গ এইসকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেলঙ্গ আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুমঙ্গ সেটা তোমাদের ভালো লাগে নিঙ্গ বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলেন যে, আমার হাতখরচের টাকা বন্ধ করে দিলেঙ্গ তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুমঙ্গ আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুমঙ্গ আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছিঙ্গ একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নিঙ্গ আমাকে খুশি না করলেও চলে অঅর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল নাঙ্গ

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছেঙ্গ সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলেঙ্গ একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নিঙ্গ আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় করঙ্গ বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ নাঙ্গ

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলেঙ্গ বিন্দুর বর ঠিক হলঙ্গ বড়ো জা বললেন, 'বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেনঙ্গ''

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালোঙ্গ বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, ''দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেনঙ্গ''

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, ''বিন্দু, তুই ভয় করিস নে — শুনেছি, তোর বর ভালোঙ্গ''

বিন্দু বললে, ''বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবেঙ্গ''

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে নাঙ্গ বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেনঙ্গ

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় নাঙ্গ সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানিঙ্গ বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল নাঙ্গ কিসের জোরেই বা বলবঙ্গ আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবেঙ্গ

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে — কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালোঙ্গ ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠেঙ্গ

বিন্দু বললে, ''দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কিঙ্গ''

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুমঙ্গ

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, ''দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো নাঙ্গ''

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়লঙ্গ কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছেঙ্গ তিনি বললেন, ''জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সবঙ্গ কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে নাঙ্গ''

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই — বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোকঙ্গ

অঅমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়ঙ্গ কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই — সেটা তাদের কৌলিক প্রথাঙ্গ

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে নাঙ্গ কাজেই চুপ করে যেতে হলঙ্গ কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান নাঙ্গ দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন — আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুমঙ্গ বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নিঙ্গ দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরোঙ্গ

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ''দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?''

আমি বললুম, ''না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করবে নাঙ্গ''

তিন দিন গেলঙ্গ তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুমঙ্গ সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁকঙ্গ

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছেঙ্গ আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলঙ্গ

বিন্দুর স্বামী পাগলঙ্গ

'সত্যি বলছিস, বিন্দি?''

''এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগলঙ্গ শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না — কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেনঙ্গ তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেনঙ্গ শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেনঙ্গ''

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুমঙ্গ মেয়েমানুষকে মেয়েমানুস দয়া করে নাঙ্গ বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়ঙ্গ ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটেঙ্গ'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়ঙ্গ বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠলঙ্গ বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলেঙ্গ হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালার ভাত খেতে দিয়েছেঙ্গ এই তার রাগঙ্গ বিন্দু তো ভয়ে মরে গেলঙ্গ তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেলঙ্গ শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে নাঙ্গ সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানকঙ্গ বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হলঙ্গ স্বামী সে-রাত্রে ঠাণ্ডা ছিলঙ্গ কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেলঙ্গ স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেইঙ্গ

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগলঙ্গ আমি বললুম, ''এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়ঙ্গ বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারেঙ্গ''

তোমার বললে, ''বিন্দু মিথ্যা কথা বলছেঙ্গ''

আমি বললুম, ''ও কখনো মিথ্যা বলে নিঙ্গ''

তোমরা বললে, ''কেমন করে জানলেঙ্গ''

আমি বললুম, ''আমি নিশ্চয় জানিঙ্গ

তোমরা ভয় দেখালে, ''বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবেঙ্গ''

আমি বললুম, ''ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সে। ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে নাঙ্গ''

তোমরা বললে, ''তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকিঙ্গ কেন, আমাদের দায় কিসেরঙ্গ''

আমি বললুম, ''আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করবঙ্গ''

তোমরা বললে, ''উকিলবাড়ি ছুটবে নাকিঙ্গ''

এ কথার জবাব নেইঙ্গ কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করবঙ্গ

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছেঙ্গ সে বলছে, সে থানায় খবর দেবেঙ্গ

আমার যে কী জোর আছে জানি নে — কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরুপ্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল নাঙ্গ আমি স্পর্ধা করে বললুম, ''তা দিক্ থানায় খবর!''

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকিঙ্গ খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেইঙ্গ তোমাদের সে। আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছেঙ্গ বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবেঙ্গ

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালেঙ্গ তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলেছিল নাঙ্গ মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সে। তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদঙ্গ

আমার বড়ো জা বললেন, ''ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করবঙ্গ তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটেঙ্গ''

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছে, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নিঙ্গ বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেলে কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল নাঙ্গ আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেনঙ্গ তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম নাঙ্গ

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব নাঙ্গ আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার যে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নিঙ্গ তাকে আমি ডেকে বললুম, ''বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎঙ্গ বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব নাঙ্গ''

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হতঙ্গ

শরতের সে। আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, ''আবার কী হা।মা বাধিয়েছ''ঙ্গ

আমি বললুম, ''সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম — কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তিঙ্গ''

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, ''বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?''

আমি বললুম, ''বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুমঙ্গ কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেইঙ্গ''

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠলঙ্গ আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে নাঙ্গ তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে — কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবেঙ্গ সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম নাঙ্গ

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছেঙ্গ শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধলঙ্গ হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেইঙ্গ

শরৎ খবর নিতে ছুটলঙ্গ সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, ''বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেঙ্গ এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নিঙ্গ

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেনঙ্গ আমি তোমাদের বললুম, ''আমিও যাবঙ্গ''

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে নাঙ্গ এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবঙ্গ আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠাঙ্গ

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারের সমস্ত ঠিক হলঙ্গ আমি শরৎকে ডেকে বললুম, ''যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবেঙ্গ''

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, ''ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব — ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবেঙ্গ''

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এলঙ্গ তার মুখ দেখেই আমার বুখ দমে গেলঙ্গ আমি বললুম, ''কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?''

সে বললে, ''নাঙ্গ''

আমি বললুম, ''রাজি করতে পারলি নে?''

সে বললে, ''আর দরকারও নেইঙ্গ কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছেঙ্গ বাড়ির যে ভাইপোটার সে। ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছেঙ্গ''

যাক্, শান্তি হলঙ্গ

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠলঙ্গ বলতে লাগল, ''মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছেঙ্গ''

তোমরা বললে, ''এ সমস্ত নাটক করাঙ্গ'' তা হবেঙ্গ কিন্তু নাটকের তামাসটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিতঙ্গ

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটেঙ্গ যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি — মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনের মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হবে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল নাঙ্গ মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিনি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেনঙ্গ কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিলঙ্গ যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারতঙ্গ

আমি তীর্থে এসেছিঙ্গ বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিলঙ্গ

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল নাঙ্গ তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা

অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারিঙ্গ যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হয় তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুমঙ্গ অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে — আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়ঙ্গ

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব নাঙ্গ আমি বিন্দুকে দেখেছিঙ্গ সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছিঙ্গ আর আমার দরকার নেইঙ্গ

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নিঙ্গ ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছেঙ্গ ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়োঙ্গ তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়ঙ্গ মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়োঙ্গ সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ — সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়ঙ্গ সেখানে সে অনন্তঙ্গ

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধলঙ্গ বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেনঙ্গ তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই আন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নেঙ্গ তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবেঙ্গ কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার — কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত — আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল — কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখ কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারেঙ্গ ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে নাঙ্গ

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নেঙ্গ আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জঙ্গ

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলেনঙ্গ ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই অঅবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিলঙ্গ সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেলঙ্গ আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেইঙ্গ আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেনঙ্গ এইবার মরেছে মেজোবউঙ্গ

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি — ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সে। আমি করব নাঙ্গ মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল — তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নিঙ্গ মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু — তাতে তার যা হবার তা হোকঙ্গ' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকাঙ্গ

আমিও বাঁচবঙ্গ আমি বাঁচলুমঙ্গ

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন —

মৃণাল

শ্রাবণ ১৩২১

৩৮.৫ সারাংশ

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের উপস্থাপনায় সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির বাড়ীর মেজ বৌ মৃণাল পিস্ শাশুড়ীর সে। শ্রীক্ষেত্র গিয়ে তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখছেঙ্গ

বিয়ের পনেরো বছর পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে জগত এবং জগদীশ্বরের সে। তাঁর সম্বন্ধ জানতে পেরেছে - এ সংবাদ স্বামীকে জানিয়েছেঙ্গ

মৃণাল দুর্গম পাড়া গাঁয়ের মেয়েঙ্গ বৌ — মেজবৌ হয়ে এসেছে কলকাতার ইট কাঠের চার দেওয়ালের অন্দরমহলেঙ্গ এ বাড়ীর বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার, অসতর্ক বিধাতা মেজেবৌকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি বুদ্ধি দিয়েছেন শুধু নয়, সেই সে। তাঁর ছিল কবিতা লেখার ক্ষমতাঙ্গ

কোলকাতার বনেদি বাড়ীর আভিজাত্য — বাড়ীর সদরের বাগান, ঘরের সাজসজ্জা — আসবাবের অভাব নেই; কিন্তু অন্দরটি ছিল তার উল্‌টো — সেখানে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেইঙ্গ আলো জ্বলে মিট্‌মিট্ করেঙ্গ হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করেঙ্গ উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না, দেওয়াল, মেঝের কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করেঙ্গ এখানে মেয়ে-মানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে নিয়মঙ্গ

এ বাড়ীর আতুড়ঘরে মেজবৌয়ের মেয়েটি জন্ম নিয়ে মারা গেলঙ্গ মায়েরও ডাক এসেছিলঙ্গ ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে সন্ধ্যা তারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল — মা হবার দুঃখটুকু পেলেও মা হবার মুক্তিটুকু পেলে নাঙ্গ মেজ বৌ থেকে মা হয়ে সংসারে থেকেও বিশ্বসংসারের হয়ে উঠতে পারলে নাঙ্গ

মেজবৌ সংসারের নিত্য কর্মে আবার জড়িয়ে পড়েঙ্গ বড় জায়ের বোন বিন্দু সংকটে পড়ে দিদির কাছে আশ্রয় নেয়ঙ্গ বাড়ীর লোকেরা ভাবলে এ আবার কোন আপদঙ্গ মেজবৌ সমস্ত মন, সমবেদনা নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালোঙ্গ বড়বৌ বিন্দুকে সাংসারিক কাজে নিযুক্ত করে খাওয়া পড়ার যৎসামান্য ব্যবস্থা করলেনঙ্গ বড়জা'র সংকট ও বিন্দুর দুরবস্থা দেখে মেজবৌর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে — সে শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাবোধ করে — বিন্দুকে নিজের ঘরে টেনে নেয়ঙ্গ বিন্দু ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেলঙ্গ স্নেহস্পর্শে বুঝল তার আশ্রয়কেঙ্গ বিন্দুর ভয় ভাঙলঙ্গ সে মেজবৌকে এমন গভীরভাবে ভালবাসলে যেন পাগল হয়ে উঠলঙ্গ প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া যখন লাগল, বিন্দুর অনাদৃত চিত্তও যে আগাগোড়া রঙিন হয়ে উঠল; মেজবৌও তখন হৃদয়ে অনুভব করলে, জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসেঙ্গ এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে

মেজবৌ তার নিজের স্বরূপকে দেখেছে — আবিষ্কার করেছে জীবনের মুক্ত রূপঙ্গ

বিন্দুকে নিয়ে প্রতিকূলতার সীমা ছিল নাঙ্গ কিন্তু সব বাধা অস্বীকার করে বিন্দুর আনুকূল্য করায়, তাঁর হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলঙ্গ

অবশেষে, বিন্দুর বয়স বেড়ে যাওয়ার বিব্রত হয়ে তাকে বিদায় করবার উপায় তৈরী হোলঙ্গ বিন্দুর বর ঠিক হোলঙ্গ বিয়ের পর জানা গেল সে পাগলঙ্গ বিন্দুর শাশুড়িও পাগলঙ্গ বিন্দু পালিয়ে এসে, গোপনে এ বাড়ীতে আশ্রয় নিলেঙ্গ পরে এ বাড়ীর সংকট এড়াতে সে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়ঙ্গ সেখানে, শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেঙ্গ

বিন্দুর এমনই পোড়া কপাল সে বেঁচে থেকেও রূপ-গুণের জন্য কোন যশ পায় নিঙ্গ মরে গিয়েও লোকেদের চটিয়ে দিলেঙ্গ মেজবৌ মৃণাল বলেছে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে খাওয়া পরায় অস্বচ্ছলতা ছিল না, কারও বিরুদ্ধে সেরকম কোন নালিশ না থাকলেও এটা বোঝা গেছে এ বাড়ীতে মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেইঙ্গ কিন্তু বিন্দু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়ঙ্গ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সে তার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়োঙ্গ বিন্দুর এই মৃত্যুতে মৃণাল নতুনতর সত্যকে আবিষ্কার করেছে, অভ্যাসের অন্ধকার এতদিন তাকে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দু তার মৃত্যু দিয়ে সেই আবরণ আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়েছে — মেজবৌ মরেছে, মৃণালের সামনে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জঙ্গ তাঁর শেষ কথা — আমি বাঁচব, আমি বাঁচলুমঙ্গ মীরাবাঈকে বাঁচবার জন্য মরতে হয়নিঙ্গ

৩৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছিলেন 'সবুজপত্র'-এর ১৩২১ সনের শ্রাবণ সংখ্যায়ঙ্গ এটি চলিতভাষায় লেখা তাঁর প্রথম গল্পঙ্গ এদিক থেকে বিচার করলেও, এই গল্পের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছেঙ্গ শুধু বিষয়বস্তুই নয়, প্রকাশ মাধ্যমের ব্যাপারেও এর অভিনবত্ব লক্ষণীয়ঙ্গ চলতি ভাষায় লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির আয়তনে রচিত এই গল্পের মাধ্যমে নারীর আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা সোচ্চার হয়েছে, তাকে আমাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবে উল্লেখনীয় বলেই মানতে হবেঙ্গ যেদেশে নারীত্বের আদর্শ হিসেবে সর্বদাই শেখানো হয়েছে যে, স্ত্রী হবে স্বামীর ''ছায়া ইব অনুগতা'' সেখানে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আর সকলের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এবং নিজের সেই উপলব্ধিকে বাঙ্ময় করে তোলার এমন নজির গত শতাব্দীর প্রথমদিকের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল নেহাৎই অকল্পনীয়ঙ্গ রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সূত্রে নারীর স্বপ্রতিষ্ঠ হবার, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করার অনাগত কালকেই যেন পূর্বঘোষিত করতে চেয়েছেনঙ্গ

অবশ্য সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিবাদিনী নারী এই গল্পের নায়িকা মৃণালই একা নয়ঙ্গ তার মতোই 'মানভঞ্জন'-এর গিরিবালা কিংবা 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা উপেক্ষা, অপমান ও অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীকে ত্যাগ করেছেঙ্গ এদের তিনজনের মধ্যে যে ভাবগত মিলটা আছে, তা হল এরা প্রত্যেকেই স্বামীগৃহের রক্ষণশীল, পুরোনোপন্থী আর্থ-সামাজিক মূলবোধকে বর্জনীয় বলে উপলব্ধি করেছে এবং তার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে নিজের পায়ের তলার জমি নিজেই খুঁজে নেবার অভীপ্সায়ঙ্গ

এই ধরনের আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী আরও যেসব নারীকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে আমরা দেখি (যেমন ঃ 'চিত্রা।দা' কাব্যনাট্যের চিত্রা।দা, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী; 'গোরা'-র

ললিতা; 'চতুর।'-এর দামিনী, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী; কাহিনী-কাব্য 'নিষ্কৃতি'-র মঞ্জুলিকা এবং 'অমৃত'-র অমিয়া) তাদের সঙ্গে। মৃণাল এবং অনিলা-গিরিবালার পার্থক্য আছেঙ্গ তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের দীপ্র ঘোষণায় মুখর ঠিকই কিন্তু এই তিনজনের মতন সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মেল-শ্যভিনিজ্‌মকে ধিক্কার দিয়ে বিদ্রোহ করেনিঙ্গ মৃণালের বিদ্রোহ আবার এই তিনজনের মধ্যে তীব্রতর — কেননা, সে তার চিঠির মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির সমস্ত পরিবারটাকেই যেন ন্যায়-নীতির কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেঙ্গ

মৃণাল যেভাবে তার স্বামীকে সম্বোধন করে চিঠি শেষ করেছে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল'') তার সঙ্গে। তার প্রারম্ভিক সম্বোধনটির (''শ্রীচরণকমলেষু'') তুলনা করলেই বোঝা যায় যে, এই কাহিনীর মধ্যে কীভাবে তার জীবনাদর্শটি বাঙ্‌ময় ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেঙ্গ তার যে-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য, সেটি তো এদেশের পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোদের প্রেক্ষিতে নারীর মর্যাদাবোধ ও ন্যায়স।ত পারিবারিক-সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ আত্মসমীক্ষাঙ্গ সমাজ বাস্তবতার এই গভীর উপলব্ধির স্তরটির সঙ্গে। সংযুক্ত হয়েছে একটি প্রত্যক্ষ-বহির্ে।র কাহিনী, যা গড়ে উঠেছে বিন্দুর জীবনের করুণ ট্র্যাজেডির অনুষঙ্গে।

ধনীগৃহে আশ্রিতা আত্মীয়কন্যার প্রতি সমগ্র পরিবারের উপেক্ষা এবং হৃদয়হীনতার কাহিনী অবশ্য সেযুগের বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল ছিল নাঙ্গ কিন্তু বিন্দুর জীবনে বিবাহ নামক 'দুর্ঘটনাটি' সাংসারিক সীমানাকে অতিক্রম করে একটা সামাজিক ভ্রষ্টতার বিধানকেই স্পষ্টচিহ্নে সূচিত করে তুলেছেঙ্গ আর তার উপলক্ষেই মৃণাল বিদ্রোহ করেছে নিজের শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধেঙ্গ বস্তুত, তার ঐ বিদ্রোহ আসলে চিরাভ্যস্ত সামাজিক-বিধিবিধানের অপহ্নবী চরিত্রের বিরুদ্ধেই — এমন বললেও ভুল হবে নাঙ্গ

বিন্দুর বিয়ে এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর সূত্রে যে-অমানবিক হৃদয়হীনতার উদ্‌ঘাটন ঘটেছে এই গল্পে, তা আমাদের সমাজে খুবই পরিচিত, সুলভ; হয়ত আজওঙ্গ বিন্দুর ট্র্যাজেডিকে হয়ত আমরা ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনী হিসেবেই গণ্য করতাম, যদি-না মৃণালের জবানিতে সেটার অন্তর্বীক্ষণ করতে বাধ্য হতাম আমরা, এই গল্পের পাঠকরা, যদি না তার 'চোখে' আমরা সমস্ত ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতাম; যদি এই ব্যক্তিগত চিঠিকে ন্যায়নীতির এজলাসে দাঁড়ানো আসামীরূপে ভ্রান্ত সামাজিক-মূল্যবোধের উদ্দেশে তর্জনী তোলা একটি অভিযোগপত্র বলে না অনুভব করতাম আমরাঙ্গ

ঙ্গঙ্গঙ্গ

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে উদ্দিষ্ট স্বামীট নামহীন; সেটা আমাদের তৎকালীন দেশাচার হিসেবে খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এর একটি প্রতীকী তাৎপর্যও আছেঙ্গ মৃণালের এই 'নামহীন' স্বামীটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা 'স্বামী-সাধারণের' প্রতিনিধিঙ্গ তাই গল্পের শুরুতে মৃণালের সম্বোধনে সে, একা (তাই, ''শ্রীচরণকমলেষু''); কিন্তু কাহিনীর শেষে সে, গোটা পরিবারের (হয়ত সমগ্র সমাজবিধানের বাহকদেরই) প্রতিনিধিঙ্গ আর সেই কারণেই সম্বোধনটা রূপান্তরিত হয়েছে বহুবচনে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'')ঙ্গ এই বহুবাচনিক উক্তিটি তাই সমগ্র পুরুষ-শাসিত সমাজবিধিবাহকদের উদ্দেশেই যে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না আদৌঙ্গ

'শ্রীচরণকমলেষুর' আশ্রয় থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে মৃণাল নিজের স্বাধীন সত্তাকে উন্মুক্ত করতে

প্রয়াসী হয়েছেঙ্গ পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে শ্বশুরবাড়ির সদর দরজার ওপারে সে পা বাড়ায়নি; তাই স্বামীকে চিঠি লেখারও কোনও উপলক্ষ তার ঘটেনি (বা, জোটেনি)ঙ্গ কিন্তু সেই অতিপরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মাঝেই যে-সুপ্রবল এক অপরিচয় লুকিয়েছিল, তাই প্রমাণিত হয়েছে মৃণালের এই চিঠিতেঙ্গ শ্বশুরবাড়ির ঐ দম-আটকানো পরিবেশেও (যাকে রবীন্দ্রনাথেরই 'মুক্তি' কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃতির সূত্রে বলতে পারি ''রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'') তার স্বকীয় অস্তিত্বের বোধটাকে নির্মূল করে তুলতে পারেনিঙ্গ ঘরকন্নার বাইরে মৃণালের সংোপন আত্মিক মুক্তি কবিতা লেখায়ঙ্গ সেখানে কোনও পারিবারিক বা সামাজিক অনুশাসনের প্রাকারই তার একান্ত-নিজের অস্তিত্ববোধটাকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নিঙ্গ কিন্তু তার এই কবিতা লেখার কথাটা পনেরো বছরের মধ্যে কেউই — এমনকী তার স্বামীও জানতে পারেনিঙ্গ মৃণালের সৃষ্টির আবেগের অংশ নিতে পারেনি সেঙ্গ সেই অপরিচয়ের ব্যবধানটুকু দেড় দশক ধরে উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে দুজনের মধ্যে — সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুও তাদের সেই বিচ্ছিন্নতাকে একই অনুভবের অংশীদার করতে পারেনিঙ্গ মৃণাল যে শিশুটির মা হয়ে 'মাতৃত্বের যন্ত্রণাটুকু' পেয়েছিল, কিন্তু 'মাতৃত্বের মুক্তিটুকু' পায়নি — সেই 'মেয়েসন্তান'-টির মৃত্যুরও কারণ ছিল তাদের পারিবারিক-সংস্কারাচ্ছন্নতাইঙ্গ আঁতুড়ঘরের অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক থেকে বার হয়ে শোবার ঘরের সুস্থ পরিবেশে সে ঢুকতে পায়নিঙ্গ মৃণালের নিজেরও তখন মুমূর্ষু অবস্থা ঃ ''আগলা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে'', যম ঠিক মতো টান মারলে সেদিন 'শিকড়সুদ্ধ' সেও উপড়ে যেতোঙ্গ এই 'আলগা ঘাসের চাপড়া' চিত্রকল্পটি তো আসলে মৃণালের নিজেরই প্রতীক ঃ তাই তার 'বিচারবুদ্ধি' (যম নয়!) যখন তাকে টান মেরেছে, সে-ও ঐ ভাবেই সংসারের জমিনের থেকে হয়ে গেছে শিকড়সমেত উন্মুলিতঙ্গ বিন্দুর প্রতি ঐ ২৭নং মাখন বড়ালের গলির অন্য সমস্ত বাসিন্দাদের হৃদয়হীনতা সেই বিচারবুদ্ধির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্রঙ্গ বিন্দুর আত্মহননে তা চূড়ান্ত হয়ে গেলঙ্গ

বিন্দু যখন ২৭নং বাড়িতে আশ্রয়ভিখারী হয়ে এসেছে, তখন সারা পরিবারের (মায়, তার আপন দিদিরও!) বিরক্তি, গঞ্জনার বিপরীতে একমাত্র মৃণালই তাকে স্নেহ এবং মমতা দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছেঙ্গ অসুস্থ সেই কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে সেই আঁতুড়ঘরেরই (যেখানে তার সদ্যোজাত কন্যাটি মারা যায়) এককোণে আশ্রয় নেওয়াটা তার বুভুক্ষু মাতৃসত্তারই এক অলক্ষ্য আত্মপ্রকাশঙ্গ তার মরে যাওয়া ঐ মেয়েটিকেই সে যেন ঐ ঘুপচি আঁতুড়ঘরের অন্ধকারে ফিরে পেল বালিকা বিন্দুর মধ্যেঙ্গ এবং ঠিক এই কারণেই বিন্দুর প্রতি অবিচারগুলো মৃণালের মনের গভীরে বিম্বিত হয়েছে তার নিজের মৃতা মেয়েটির প্রতি অবিচার হিসেবেই — যে জন্মের কদিন পরেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার 'আপনজন'দের (!) অবিমৃষ্যকারী সংস্কারাচ্ছন্নতার পরিণামে (ইংরেজ ডাক্তারের তিরস্কারের কথাটা এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য অবশ্যই) ঙ্গ তাই পরবর্তীকালে বিন্দুর মর্মান্তিক মৃত্যু (প্রকৃতপক্ষে যার জন্যে দায়ী মৃণালের শ্বশুড়বাড়ির লোকজনই) নতুন করে তার নিজের কন্যাবিয়োগের স্মৃতিকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলল; এবং সেটাই মৃণালের এতবড় গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার পথটাকে খুলে দিল একবারেঙ্গ গায়ে আগুণ ধরিয়ে বিন্দুর আত্মহননকে মৃণাল পারিবারিক-সামাজিক অনুশাসনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ হিসেবে গণ্য করেনি; তার কাছে সেটা প্রতীত হয়েছিল সমস্ত নির্যাতিতা নারীর হয়ে এক প্রজ্জ্বলন্ত প্রতিবাদের প্রবল প্রতীক হিসেবেই, সেই প্রতিবাদের অনল-আলোকে মৃণাল নিজের মনেরও সকলটুকুকে পুরোপুরি দেখতে পেয়েছিল, আর পরিণামে তার নিজের প্রতিবাদের মশালও সে যেন ঐ 'আগুনেই' জ্বালিয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেলঙ্গ

মৃণাল, স্বামীকে ছেড়ে আসার এই দলিলে মীরাবাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেঙ্গ মহারাণী মীরার সে। মেবার রাজপরিবারের দ্বন্দ্বটাও ছিল আদর্শগত, যদিও তা একান্তভাবেই আধ্যাত্মিকঙ্গ মৃণাল নিজে কবিতা লিখত; তাই সে মধুসূদনের 'বীরা।না' কাব্যের কথাটাও স্মরণ করতে পারত হয়তঙ্গ বা জাহ্নবী কর্তৃক শান্তনুকে পরিত্যাগ করে যাবার কথাটা তার মতো মেয়ের জানা থাকাই স্বাভাবিকঙ্গ তবে মৃণালের এইভাবে স্বামীকে ছেড়ে যাবার অন্তরালে কোনও আধ্যাত্মিক, কিংবা পৌরাণিক প্ররোচনা নেইঙ্গ চিরকাল এদেশে 'পতিদেবতারাই' স্ত্রীদেব পরিত্যাগ করে এসেছেন — এখানে ঘটল তার ঠিক বিপরীত ব্যাপারটাইঙ্গ এক্ষেত্রে অবশ্য মৃণালই প্রথমা নয়; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — এর ভ্রমর তার পূর্বসূরিকাঙ্গ কিন্তু মৃণালই সর্বপ্রথম স্বামীকে উপলক্ষ করে সমগ্র সমাজবিধানটাকেই আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছেঙ্গ ভ্রমরের মতো স্বামীর ব্যভিজারের জন্য নয়, গোটা পরিবারের এবং সমাজের অনাচারের শরিক হবার কারণেই মৃণাল স্বামীর সে। সম্পর্ক ছেদ করেছেঙ্গ খাওয়া-পরার অস্বচ্ছল দুঃখ তার ছিল না স্বামীর সংসারে, ছিল না স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কোনও অপ্রতুলতাঙ্গ তার স্বামীর নৈতিক চরিত্রও ছিল অকলঙ্কঙ্গ তবু মৃণাল স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেঙ্গ তার নারীত্ব, তার মাতৃত্ব, তার মনুষ্যত্ব এবং আত্মস্বতন্ত্র সম্মানের বোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে প্রণোদিত করেছে এতবড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেঙ্গ ২৭ নং মদন বড়ালের গলির পাঁচিলবন্দী পনেরো বছরের জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ে সে ঠাঁই নিয়েছিল মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত উপকূলে — পুরীধামেঙ্গ এটিও একভাবে প্রতীকী ব্যঞ্জনাবহ বৈ কি! মীরাবাই, কি ভ্রমর, বা গিরিবালা, কিংবা জাহ্নবী, অথবা অনিলার স্বামী-সংসার ত্যাগের সে। এই জন্যে মৃণালের সব ছেড়ে চলে যাওয়াটা মেলে নাঙ্গ এমন কী, এই গল্পের সমসাময়িক 'বোষ্টমী' গল্পের নায়িকাও স্বামী ছেড়ে চাওয়ার সে। এর গরমিল! বোষ্টমী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় স্বামীর অনুমতি নিয়েই — বৃহত্তর এক হৃদয়াবেগের আকুতিতে আকূল হয়েইঙ্গ মৃণালের বেলায় তো তা হয়নি!

৮৩৮

হেনরিক ইবসেনের 'এ ডল'স হাউজ'-এর নোরার সে।ও মৃণালের তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশের সমালোচক মহলে রয়েছেঙ্গ নোরার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিল, সে তার স্বামীর খেলার পুতুল হয়ে থাকতে চায়নি বলেঙ্গ সেও যে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি নারী, একজন মানুষ - একথা তার স্বামী উপলব্ধি না করে, তাকে আদরে-আহ্লাদে, পোশাকে-গয়নায়, উচ্ছ্বাসে-উৎসাহে নিজের একটি জীবন্ত খেলনা হিসেবে দেখতেই ব্যতিব্যস্ত ছিল! এর বিরুদ্ধেই নোরার প্রতিবাদ এবং শেষ দৃশ্যে সজোরে সদর দরজা বন্ধ করে স্বামীর ঘর থেকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘটনাটা তারই দ্যোতনাবাহীঙ্গ নোরার ঐ আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা - নারীর মানবিক মুক্তির এক ধরনের অভিপ্রকাশ; আর মৃণালের এই বিদায়, আর একভাবে, আর এক পরিপ্রেক্ষিতে সেই নারীরই মুক্তি ঘোষণার প্রয়াসঙ্গ

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি যতই সামাজিক তাৎপর্যময় হোক না কেন, তার কয়েকটি দুর্বলতার কথাও কিন্তু উল্লেখ না করে আলোচনা শেষ করা যায় নাঙ্গ এই গল্প, 'একটি' নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে যতখানি দামী, ততখানি শিল্পঋদ্ধ নয়ঙ্গ মৃণালের চরিত্রও যতটা দীপ্র এবং বলিষ্ঠ, ততটা সূক্ষ্ম জটিল অনুভবে উদ্বেল হয়নিঙ্গ তার মগ্নচৈতন্যের গভীরে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে-পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের যে টানাপোড়েন প্রত্যাশিত ছিল, তা কোনও প্রতিভাস এতে ব্যঞ্জিত হয় নি, কোনও সময়েই নাঙ্গ বিন্দুকে উপলক্ষ করে তার যে নিজস্ব আবেগ ক্রিয়াশীল ছিল — সেটাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সে। মিশে গেছেঙ্গ নিজের রূপ এবং বুদ্ধি এবং কবিত্ব — এই সব নিয়ে একটা অনুচ্চারিত অহম্‌বোধও তার সে। জড়িয়ে

ছিলঙ্গ বৃহত্তর সামাজিক জটিলতার দিকে তার চিঠির মাধ্যমে পাঠকের দৃস্টি পড়ে ঠিকই, কিন্তু মূলত সেটা ২৭নং মদন বড়ালের গলির বাসিন্দা একটি পরিবারের সেজ বউয়ের 'পার্সনাল টেস্টামেন্ট' হিসেবেই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেঙ্গ

এই একক প্রতিবাদ অনাগত সামাজিক বিপ্লবের পূর্বপ্রতিভা হিসেবে কতখানি গণ্য হয়েছে বা হতে পারে, সেই নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই থাকবেঙ্গ কিন্তু সবটুকু মিলিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন ভাবনার মুক্তি ঘটালেন যে আমাদের কথা কথাসাহিত্যে, সে কথা অনস্বীকার্যঙ্গ

৩৮.৭ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণাপত্র বলা যায় কি-না বিশ্লেষণ করঙ্গ

২) 'স্ত্রীর পত্র' অবলম্বনে ১৯শ শতকের শেষভাগে / ২০শ শতকের গোড়ায় কলকাতার বনেদী গৃহস্থ পরিবারগুলির একটি লেখচিত্র রচনা করঙ্গ

৩) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের চিঠির শেষে মৃণালের যে উক্তি, ''আমিও বাঁচবঙ্গ আমি বাঁচলুমঙ্গ''— এর তাৎপর্য কী বিশ্লেষণ করে দেখাওঙ্গ

খ) সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে চিঠির শুরুতে মৃণাল স্বামীর উদ্দেশে লিখেছে, ''শ্রীচরণকমলেষু'' এবং সব শেষে লিখেছে, ''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'' — এই পার্থক্যের কারণ কোথায় নিহিত?

২) 'আডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গে এবং মেবারের মহারাণী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে মৃণালের পার্থক্য কোথায়?

৩) 'মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেনঙ্গ'' — এটা কার উক্তি? এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি?

৪) ইংরেজ ডাক্তার কেন এসেছিলেন বিন্দুদের বাড়িতে? তিনি কী করেছিলেন? কেন?

৫) ''তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকেঙ্গ'' — একথা নিহিতার্থ কী?

৬) স্বামী-সংসার ছেড়ে মৃণাল শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন?

৭) ''ঘাসের চাপড়া'' কথাটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে কোন্ তাৎপর্য বহন করে?

গ) সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) বিন্দুর সঙ্গে মৃণালের পারিবারিক এবং মানসিক সম্পর্ক দুটি কী কী?

২) ''ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা'' মৃণালের গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকার করতে লাগলেন কেন?

৩) মৃণালের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা কী?

৪) শরৎ কে? সে কী খবর এনেছিল?

৫) মৃণাল শরতের কাছে ''লোক দিয়ে'' কী পাঠিয়ে দিত?

৬) বিন্দু শ্বশুরবাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

৭) বিন্দুর পাগল স্বামী তাকে কে বলে ভাবত?

৮) শরৎ কোন্ পরীক্ষায় ফেল করেছিল? কেন?

৯) মৃণালের বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে ক-জন গিয়েছিল?

১০) মৃণাল বসন্তের আগমনী-সংকেত কীভাবে পেত?

৩৮.৮ উত্তর সংকেত

বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১) প্রাথমিক আলোচনার প্রথম অংশটি লক্ষ্য করুনঙ্গ এরপর মূলপত্রের উত্তর করুনঙ্গ

২) গল্পে বর্ণিত মৃণালের বাড়ীর পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট পারিবারিক চিত্র সংক্ষেপে লিখুনঙ্গ

৩) মৃণাল স্বামী গৃহের রক্ষণশীল, পুরনোপন্থী, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা পীড়িত বোধ করেছেঙ্গ তার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেঙ্গ উক্তিটির মধ্যে তা-ই ব্যঞ্জিত হয়েছেঙ্গ প্রাসাঙ্গিক আলোচনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে যথাযথ উত্তর করতে সচেষ্ট হোনঙ্গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১) প্রাসাঙ্গিক আলোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর করুনঙ্গ

২) প্রাথমিক আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর করুনঙ্গ

৩) উক্তিটি বিন্দুর দিদিরঙ্গ মেজবৌ মৃণালের বড়জা-রঙ্গ মৃণাল বিন্দুকে স্নেহাশ্রয় দেওয়ায় বড়বৌ বলে মনে খুশী হলেন এবং বাড়ীর অন্যান্যদের অনুযোগ থেকে বেঁচে গেলেনঙ্গ তিনি তাঁর ছোট বোন বিন্দুকে ভালবাসলেও নিজে সেই স্নেহ দেখাতে পারতেন নাঙ্গ মেজ-বৌ সস্নেহে তাকে গ্রহণ করায় তাঁর মনটা হাল্কা হয়েছিলঙ্গ কিন্তু এ কথা প্রকাশ করার শক্তি তার ছিল না বলে, উদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেনঙ্গ বাইরে তাই এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরী করতে লাগলেন যে এজন্য তিনি দায়ী ননঙ্গ

৪) বিন্দুর মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেলঙ্গ বিন্দুর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হলে ইংরেজ ডাক্তার ডাকা হয়ঙ্গ তিনি অন্দর দেখে আশ্চর্য হলেও আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিলেনঙ্গ কেননা সেখানে

আলো জ্বলে মিটমিট করেঙ্গ হাওয়ায় চোরের মত ঢোকে, উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় নাঙ্গ দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করেঙ্গ এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কারও যেন লজ্জা বা দুঃখবোধ ছিল নাঙ্গ

৫) মেজবৌ মৃণালের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে উত্তর দিনঙ্গ

৬) বিন্দুর মৃত্যুর পর মেজবৌ মৃণালের মনে নতুন ভাবোদয় হয়ঙ্গ ২৭ নম্বর বাড়ীর মধ্যেকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অন্দর মহলের তুচ্ছ ইট কাঠের আড়ালে টিকে থাকার চেয়ে বাড়ীর চৌকাঠ পেরিয়ে মেজবৌ-এর খোলস ছিন্ন করে বিশ্বজগতের ছয় ঋতুর সুধাপাত্রে ভরা আনন্দলো যাত্রার উদ্দেশ্যে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলঙ্গ

৭) মূলপাঠ পড়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুনঙ্গ

সুনির্দিষ্ট উল্লেখন মূলক প্রশ্ন ঃ

আলোচনা নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠ পড়লেই সঠিক উত্তরের সন্ধান পাবেন / উত্তর লিখুনঙ্গ

৩৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *গল্পগুচ্ছ* (৩য় খণ্ড)

২) নারায়ণ গ।োপাধ্যায় — *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*

৩) প্রমথনাথ বিশী — *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*

৪) শিশির কুমার দাস — *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩ - ১৯২৩)

৫) ক্ষেত্র গুপ্ত — *রবীন্দ্রগল্প ঃ* অন্য রবীন্দ্রনাথ

৬) তপোব্রত ঘোষ — *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*

৭) ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারঙ্গ*

একক ৩৯ ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুঁইমাচা

গঠন

৩৯.১ উদ্দেশ্য

৩৯.২ প্রস্তাবনা

৩৯.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৩৯.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

৩৯.৫ সারাংশ

৩৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৩৯.৭ অনুশীলনী

৩৯.৮ উত্তরমালা

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৯.১ উদ্দেশ্য

'পুঁইমাচা' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হয় — ১৩৩১ বঙ্গাব্দেঙ্গ এ সময়েই 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভা (১৩৩০)ঙ্গ কল্লোলের উত্তাল, উচ্চ কণ্ঠ যোদ্ধৃবেশ বাংলা সাহিত্যের জগতকে যখন হতচকিত করে দিয়েছে, সেই সময় বিভূতিভূষণ মনে হয়, অনেকটা সচেতনভাবেই নীরব প্রতিবাদী ভঙ্গীতে তাঁর নিজের কথা বলতে শুরু করেছেনঙ্গ কল্লোলের লেখকরা যখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী হতে ব্যাকুল, উৎসুক, বিদ্রোহের নামে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে কিছুটা উদ্ধত, বিভূতিভূষণ তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের বর্মে নিজেকে ঢেকে রেখে নীরবে পল্লীবাসী, সহায় সম্বলহীন মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের জীবনকথা বলে চলেছেনঙ্গ পুঁইমাচার ক্ষেন্তি, সহায়হরি চাটুজ্জে, অন্নপূর্ণা চরিত্রকে বাংলার গ্রাম থেকে আলাদা করে দেখা যায় নাঙ্গ

এ এই গ্রামবাংলাকে আশ্রয় করেই বারবার এসেছে বাংলার প্রকৃতি — পল্লীগ্রামের নানা গাছপাল, পাখ-পাখালি, তাঁর নানা পালা-পার্বনঙ্গ এমনকি লোকচার ও লোক সংস্কারঙ্গ তিনি গ্রামজীবনের 'সাগা' (Saga) রচনা করেছেনঙ্গ শহুরে মধ্যবিত্তের পেছনে ফেলে আসা সেই গ্রামের চরিত্রচিত্রশালায় 'নস্টালজিয়া' অনুভব করেছেনঙ্গ ফলে তিনি বাঙালি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছেনঙ্গ

পুঁইমাচা গল্পটি পাঠ করে আপনিও তাই ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করবেন —

১) গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তির লাগান পুঁই গাছ-এর মাচা গল্পের শেষ পরিণতিকে নূতন মাত্রা এনে দিয়েছেঙ্গ

২) গ্রাম বাংলা ও তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ ও পরিবার জীবনের লেখক একটি জীবন্ত ছবি এ গল্পে এঁকেছেনঙ্গ

৩) গল্পের পরিবেশ বর্ণনায় প্রকৃতির এমন একটি শান্ত, সরল, সহজ-সুন্দর লাবণ্যময় রূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা গল্পের রসকেন্দ্রটি ব্যঞ্জনায় লেখকের প্রকৃতি-ভাবনাকেই প্রকাশ করেছেঙ্গ

৪) গল্পের শেষ পরিণতি থেকে প্রকৃতি-প্রেমিক লেখকের রোমান্টিক করিপ্রাণতার পরিচয় পাবেনঙ্গ

৫) পুঁইমাচার রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্য তার নায়িকা ক্ষেন্তির মত নিরলঙ্কারঙ্গ আর স্বভাবে সহজ ও সরল অথচ অনুভব-সংবেদনাময় ও গভীরঙ্গ এ ভাষা বিষাদঘন মুহূর্ত রচনার পক্ষে যথেষ্ট বলবান — এ উপলব্ধিও ঘটবেঙ্গ

৩৯.২ প্রস্তাবনা

'পুঁইমাচা' গল্পটি প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়ঙ্গ প্রস।ত স্মরণ করা যেতে পারে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস রচনার সূত্রপাত বৈশাখ, ১৩৩২ঙ্গ এদিক থেকে 'পুঁইমাচা' ও 'পথের পাঁচালী' সমসাময়িক কালের রচনাঙ্গ এই দুটি রচনাতেই গ্রাম বাংলার দুঃখ দুর্দশা, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পারিবারিক জীবনের কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছেঙ্গ যে জীবনকাহিনী এতে তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন অনাড়ম্বর, শান্ত, তেমনি তার ভাষ্যও অনলঙ্কৃত ও জীবনানুগ — যেন সহজ জীবনের সহজতর ভাষ্য রচনা বিশেষঙ্গ গল্প ও উপন্যাসের জীবনচর্যা ও জীবন ভাবনার এই সাদৃশ্য — গ্রাম-প্রকৃতি-মানুষ, তাঁদের চলাফেরা, সংসার প্রতিপালন, সন্তান স্নেহ সবকিছুতেই যেন অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়ঙ্গ এদিকটার প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন পুঁইমাচা গল্পটিতে পথের পাঁচালীর বীজ আছেঙ্গ অপর এক সৃষ্টিশীল লেখক-সমালোচকের বিশ্বাস কোন সৃস্টির পূর্বে লেখকের মনের গভীরে প্রত্যক্ষে বা অগোচরে একটি ছক তৈরী হতে থাকে, তারই প্রতিফলন সমকালীন গল্পে-উপন্যাসে অনেক সময় প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে ওঠেঙ্গ পুঁইমাচা ও পথের পাঁচালীতে এমনটি ঘটে থাকবেঙ্গ পল্লীর শান্ত নিস্তর। পরিবেশে দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবার জীবন — ক্ষেন্তী, সহায়হরি চাটুজ্যে ও অন্নপূর্ণা যথাস্থানে দুর্গা, হরিহর ও সর্বজয়ার পূর্বগঙ্গ দুটি রচনার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য থাকলেও উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যের কারণে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছেঙ্গ পুঁইমাচায় পাওয়া যায় প্রকৃতির পটভূমিতে উপস্থাপিত মানুষের জীবনমৃত্যুর রহস্যঘন কতকগুলি খণ্ডচিত্রঙ্গ কিন্তু প্রকৃতি সেখানে যেন অনেকটা নিরাসক্ত ও নির্মমঙ্গ

এই গল্পটি পাঠক মনোযোগ দিয়ে পড়লে লক্ষ্য করবেন আকস্মিক কোন ঘটনার চমকে এটি শেষ হয়নিঙ্গ এটি চরিত্রপ্রধান গল্পও নয়ঙ্গ গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটিকে লেখকের কবিপ্রাণতা ও প্রকৃতিপ্রেমের চরম উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়ঙ্গ পৌষ-পার্বণের দিন পিঠে গড়ার শেষে জ্যোৎস্নার আলোয় উঠানের সেই জায়গায় দুই মেয়ে ও মায়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যেখানে ''লোভী মেয়েটির ..... নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে .... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুরঙ্গ '' প্রতীক হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে লেখক এখানে তাঁর প্রকৃতি দর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেনঙ্গ গল্পের প্রাণকেন্দ্রে ক্ষেন্তি আর তাঁর পুঁই মাচার সে। প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছেঙ্গ এখানেই গল্পের 'স্নিগ্ধ' সৌন্দর্যঙ্গ পুঁইমাচা গল্পটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে আপনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেনঙ্গ

৩৯.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বুধবার, ২৯ শে ভাদ্র, ১৩০০ ব াব্দে (ইং ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) মাতুলালয় — কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারীপুর গ্রামেঙ্গ মৃত্যু ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ঙ্গ তাঁর

বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা বনগ্রাম সংলগ্ন ব্যারাকপুর গ্রামঙ্গ মায়ের নাম মৃণালিনী দেবীঙ্গ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা ও পৌরোহিত্য বৃত্তিতে সংসার প্রতিপালন করতেনঙ্গ বিভূতিভূষণের শৈশব-কৈশোর অত্যন্ত দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে অতিবাহিত হয়ঙ্গ তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেনঙ্গ বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৬-তে কলকাতার রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৮-তে ডিস্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেনঙ্গ এম.এ ও আইন পড়বার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু সংসারের চাপে পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথম জাীপাড়া স্কুলে, পরে হরিনাভী স্কুলে (সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা) শিক্ষকতা করেন (১৯২০-১৯২২)ঙ্গ হরিনাভী ছেড়ে তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার প্রচারকের কাজ করেনঙ্গ খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহ শিক্ষক, খেলাৎ ঘোষের আপ্ত-সহায়ক, তাঁর এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে ভাগলপুর সার্কেলের কাজে চলে যানঙ্গ অতঃপর তিনি খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করলেও, জীবনের শেষ পর্বে নিজগ্রামে ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপাল নগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেনঙ্গ অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় তিনি থাকতেনঙ্গ

শৈশব থেকেই তিনি পল্লীপ্রকৃতির রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ ছিলেনঙ্গ হরিনাভিতে থাকাকালে গল্প লেখায় প্রবল আগ্রহ জন্মেঙ্গ ১৯২২-এ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঙ্গ পরে ভাগলপুর বাসকালে তিনি 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটি লেখেনঙ্গ সেটি প্রথম বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে বের হয়ঙ্গ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ (১৩৩৬) ঘটেঙ্গ পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার মানুষ ও সমাজজীবন তাঁর এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্যঙ্গ তার অপর উপন্যাস আরণ্যক (১৩৪৫) ও ইছামতী (১৩৫৬) উল্লেখযোগ্যঙ্গ 'আরণ্যক' বিহারের আরণ্যক প্রতিবেশে দরিদ্র আদিবাসী জনসমাজের সহজ সুন্দর অনাবিল জীবন প্রধান প্রতিপাদ্যঙ্গ অতি পরিচিত পল্লীজীবন থেকে অনেক দূরের এই জগতটিকে তিনি শান্ত, নির্লিপ্তভাবে অন্যতম ভিন্নতর রূপকে তার এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন অলঙ্কার বর্জিত আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায়ঙ্গ

বাইরের পৃথিবী যখন — বিশ শতকের তৃতীয় দশকে — ভরে উঠেছে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রেরণায় বিহ্বল নূতনতর সমাজ গড়বার চেতনায়ঙ্গ তরুণতর শিল্পীরা এসময় জীবনকে কখনও দেখছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে; কখনও বা ফ্রয়েডীয় যৌন-সমস্যার প্রেক্ষিতেঙ্গ তাঁদের জীবন দৃষ্টিতে কখনও প্রবল প্রখর বাস্তবতা, কখনও বা আশাহত আশাবাদীর স্বপ্নভ.ের বেদনঙ্গ এ সময়ের সাহিত্য বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনিঙ্গ ফলে, জীবন দৃষ্টিতে সমগ্রতা ধরা পরেনিঙ্গ পক্ষান্তরে, বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস যুগ ও সমাজ সম্পর্কে অনেকটা নির্লিপ্ত, উদাসীন, শান্ত, সহজ, কোমল ও মধুরঙ্গ তাঁর গ্রাম, জনপদ, আকাশ, অরণ্য-পাহাড় স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণঙ্গ এভাবেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ শুধু নয়, অবগাহন করে জীবন ও জগতের মহান সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেনঙ্গ দেশ-কালের খণ্ডিত রূপের মধ্যে — অখণ্ডজীবন সত্য খোঁজেন নিঙ্গ কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যা কিছু শাশ্বত তাকে পেতে হলে খুজতে হবে সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দ ভরা সৌম্য জীবনেঙ্গ সাধারণভাবে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী' এই উপন্যাস চতুষ্টয়কে নির্ভর করেই তাঁর পরিচিতি ব্যাপ্ত হলেও, ছোটগল্প রচনাতেও বিভূতিভূষণের দক্ষতা বড় কম নয়ঙ্গ গ্রামের মানুষ এবং প্রকৃতি, সেখানেও তাঁর লেখার মুখ্য উপাদানঙ্গ দরিদ্র গ্রামবাংলার স্বল্পবিত্ত ভদ্রগৃহস্থই তাঁর লেখার মূল কুশীলবঙ্গ আর বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি — তাঁর জন্মস্থান বিশেষত, তাঁকে এমনভাবেই আবৃত্ত করে রেখেছিল যে, সামাজিক এবং পারিবারিক কাহিনী গড়ে তোলবার সময়েও তার প্রকৃতিতন্ময় ভাবটা সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকতঙ্গ আর সে জন্যই কিন্তু জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যময় ভাবনাটা তাঁর গল্প-

উপন্যাসের মানুষদের সচেতন রেখেছে, কিন্তু বেদনার বা ক্রোধের, হাহাকার অথবা বিস্ফোরণ কোনো সময়ে ঘটেনি তাদের মধ্যেঙ্গ এই বিষয়ে প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধভাবে হয়ত তার সে। জীবনানন্দ দাশের কিছুটাও তুলনা করা যায়ঙ্গ

'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', 'বেণীগির ফুলবাড়ি', 'নবাগত', 'তালনবমী', 'উপল খণ্ড', 'বিধু মাষ্টার', 'ক্ষণভ ুর', 'অসাধারণ', 'মুখোশ ও মুখশ্রী', 'আচার্য কৃপালনী কলোনি', ' কুশল পাহাড়ী', 'অনুসন্ধান', 'ছায়াছবি', 'সুলোচনা', 'প্রেমের গল্প', 'অলৌকিক' এবং 'বাক্সবদল' — মোট এই কটি তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থঙ্গ এছাড়া 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'বাছাই গল্প' — ইত্যাদি নামেও গল্প সংকলন আছেঙ্গ

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে 'পুঁইমাচা' গল্পটি পড়তে হবেঙ্গ

৩৯.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন — একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনিঙ্গ

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেনঙ্গ স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন নাঙ্গ

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন — কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটী? আঃ, ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণ তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন — তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রী অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল — ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেনঙ্গ একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন — কেন .... কি আবার .... কি ....

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন — দেখ, র। কোরো না বলিছ — ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরোঙ্গ তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — কেন? কি গুজব?

— গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়িঙ্গ কেবল বাগ্‌দী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় নাঙ্গ — সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়ঙ্গ

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন — একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছেঙ্গ আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে নাঙ্গ আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না — ও নাকি উচ্ছুগণ্ড করা

মেয়ে —গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না — যাও ভালোই হয়েছে তোমারঙ্গ এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগদী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাওঙ্গ

সহায়হতির তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন — এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপারঙ্গ একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর! — ওঃ!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন — কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমার একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? — আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠলঙ্গ হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন — হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন — না বিয়ে দেবার গা, না কিছুঙ্গ আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন — কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন — এ সব কি রে! ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে.....

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিলঙ্গ তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই-গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জ।ল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছেঙ্গ ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁই-পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্যঙ্গ

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ্ণ ও অগোছালো — বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টো ডাগর ডাগর ও শান্তঙ্গ সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেপটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানোঙ্গ পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়ঙ্গ এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল — চিংড়ি মাছ, বাবাঙ্গ গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম দিতে চায় না, বলে — তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকি আছে, আমি বললাম — দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে — আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা দিয়ে বললে, নিয়ে যা — কেমন মোটা মোটা ....

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অতযন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন — নিয়ে যা! আহা, কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছেঙ্গ পাকা পুঁইডাঁটা, কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত ... নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন — ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হলে নাঙ্গ যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ....ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতেঙ্গ বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? .... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন; আর একজন বেড়াচ্ছেন — কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ ..... ফেল্ বলছি ওসব ..... ফেল্ঙ্গ

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আগলা করিয়া দিল, পুঁই শাখের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেলঙ্গ অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন — যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো ..... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো ....

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলঙ্গ ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিলঙ্গ .... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিতঙ্গ

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন — তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে ... তুমি আবার .... বরং .....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাইলঙ্গ অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন — না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না — মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের! একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা .... তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয় ....

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছেঙ্গ তাঁর মনে বড় কষ্ট হইলঙ্গ কিন্তু মেয়ের যতই সাদের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না — নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেনঙ্গ

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সে। সে। অন্নপূর্ণার মনে পড়িল- গ ত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল — মা, অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের ....

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন — বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছেঙ্গ কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাখের তরকারী রাঁধিলেনঙ্গ

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিলঙ্গ দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাইঙ্গ পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন — কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিলঙ্গ কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেনঙ্গ

কালীমায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িলঙ্গ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন — সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে....স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে — অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষেঙ্গ তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ-সাত পুরুষে ভ।, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন — তা সমাজের সে-সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছেঙ্গ বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের ....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন —এই শ্রাবণে তেরোয় ....

— আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলের তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছেঙ্গ কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়েঙ্গ আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো? ....সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেবো নাঙ্গ সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল....পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলামঙ্গ লেখাপড়া নাই বা জানলেঙ্গ জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্‌ — রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?....

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেনঙ্গ কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সে। ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকি — শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদিঙ্গ এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় নাঙ্গ ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্রঙ্গ যাহাই হোক পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকারবধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিলঙ্গ এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাংিয়া দেনঙ্গ

দিন দুই পরের কথাঙ্গ সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেনঙ্গ বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল — বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন — যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকিঙ্গ কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেনঙ্গ ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল — তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল — ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছেঙ্গ

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সব কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন — মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল — খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্‌, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও-পাড়ায় — যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বনঙ্গ শীতের সকালে এক প্রকার লতা-পাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিলঙ্গ একটা লেজঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছেঙ্গ

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইলে বলিলঢ— খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটাঙ্গ — পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেনঙ্গ ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিলঙ্গ ... কে যেন কি খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলঙ্গ অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেনঙ্গ তাঁহারা খানিক দূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইলঙ্গ

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইলঙ্গ বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছেঙ্গ তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন — এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল — এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসবঙ্গ

ক্ষেন্তির স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন — ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে — কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং ....

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন — আমিঙ্গ না...আমি কখন্? .... কক্ষনো না, এই তো আমি...ঙ্গ সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেনঙ্গ

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো নাঙ্গ আমি সব জানিঙ্গ মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখন আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ....তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হির হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন, কিন্তু স্ত্রী চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল নাঙ্গ....

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া, বাড়ী ঢুকিলঙ্গ সম্মুখস্থ মেটে আলু দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিলঙ্গ

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন — ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা.....

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল — সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে

পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সে। সে। ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল নাঙ্গ

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন — কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এসেনছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মায়ে মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল — হ্যাঁঙ্গ

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন — পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাটের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতেঙ্গ সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, যার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনেসে হাত? এ মেয়ে আমি কি করব মা?

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল — মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভা।। পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জ।ল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবন্ধ হইয়া ফাঁকি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন ঊর্দ্ধমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছেঙ্গ ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাইঙ্গ

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন — দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়ঙ্গ এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল — কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারেঙ্গ আজকাল রাতে খুব শিশির হয়ঙ্গ

খুব শীত পড়িয়াছেঙ্গ সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছেঙ্গ .... একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিলঙ্গ সহায়হরি বলিলেন — হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

— আচ্চা দিচ্ছি বাবা - কই শীত, তেমন তো....

— হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে — অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?

— সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপঙ্গ বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেনঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার

গায়ে হয় নাঙ্গ সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি রাখিতেন নাঙ্গ জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না — ক্ষেন্তির নিজস্ব ভা।। টিনের তোর।ের মধ্যেই উহা থাকিতঙ্গ

পৌষ সংক্রান্তিঙ্গ সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন —একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেলঙ্গ ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছেঙ্গ অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহেঙ্গ অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেনঙ্গ

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল — মা, ঐ একটু....

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেনঙ্গ মেজমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মার সামনে পাতিয়া বলিল — মা, আময় একটু ...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিলঙ্গ

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখিঙ্গ ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেনঙ্গ

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল — জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবেঙ্গ

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল — এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকেঙ্গ ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছেঙ্গ

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল — হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়েই করে, সে তো কেমন লাগেঙ্গ

অন্নপূর্ণা বেগুণের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেনঙ্গ

ক্ষেন্তি বলিল — খেঁদীর ওই সব কথাঙ্গ খেঁদীর মা তো ভারী পিঠে করে কিনা! ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিরে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ....আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়ঙ্গ

বেপরোয়া ভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল — মা, নারকেলের কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস নেঙ্গ মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যাঙ্গ

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থারা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিলঙ্গ মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছেঙ্গ

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন — ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিইঙ্গ ক্ষেন্তি, জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়ঙ্গ

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেলঙ্গ পুঁটি বলিল — মা, বড়দি পিঠেই খাকঙ্গ ভালোবাসেঙ্গ ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাবঙ্গ

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল নাঙ্গ সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে নাঙ্গ সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছেঙ্গ সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে নাঙ্গ অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছেঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন — ক্ষেন্তি, আর নিবি? ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তবাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলঙ্গ অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেনঙ্গ ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল — বেশ খেতে হয়েছে মাঙ্গ ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়া নাও, ওতেই কিন্তু.....ঙ্গ সে পুনরায় খাইতে লাগিলঙ্গ

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তী, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেনঙ্গ মনে মনে ভাবিলেন — ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবেঙ্গ এমন ভালোমানুষ, কাজ কর্ম্মে বকো, মারে, গলা দাও, টু শব্দটি মুখে নেইঙ্গ উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেলঙ্গ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে নাঙ্গ তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি স।তিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে — এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘটনা কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাচ্ছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন — চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন নাঙ্গ

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইলঙ্গ অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছেঙ্গ.... তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিলঙ্গ ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল — মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও .... দু'টো মাস তো....

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন — তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক — তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলঙ্গ জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমি সুরে বলিল — না, যাবে না বৈ কি!... দেখো তো কেমন না যান্‌ঙ্গ....

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত .... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে — মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ....

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছেঙ্গ পুনরায় আষাঢ় মাসঙ্গ বর্ষা বেশ নামিয়াছেঙ্গ ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেনঙ্গ সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন —ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদাঙ্গ আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেনঙ্গ গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন — নাঃ, সব তো আর ... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেবঙ্গ ... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁ কাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন — বসন্ত হয়েছিল শুনলামঙ্গ ব্যাপারে কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় নাঙ্গ আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাওঙ্গ

— একেবারে চামার.....

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছিঙ্গ পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে.... ছোট লোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়... আরও কত কিঙ্গ পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেনঙ্গ কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল নাঙ্গ

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন — তারপর?

আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলামঙ্গ মেয়েটার যে অবস্থা করেছেঙ্গ শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনেশুনে ছোটলোকের সং। কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতেঙ্গ পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন — বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে — আজই না হয় আমি....ঙ্গ প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেনঙ্গ

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেনঙ্গ

— তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলোঙ্গ এমন চামার — বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল — তারই ওখানে ফেলে রেখে গেলঙ্গ আমায় না একটা সংবাদ, না কিছুঙ্গ তারা আমায় সংবাদ দেয়ঙ্গ তা আমি গিয়ে....

— দেখতে পাওনি?

— নাঃ! এমনি চামার — গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছেঙ্গ ...যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেলঙ্গ.... চার কি ঠিক করলে? .... পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে নাঙ্গ....

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছেঙ্গ আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিনঙ্গ এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাইঙ্গ

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেনঙ্গ পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুণ পোহাইতেছেঙ্গ

রাধী বলিতেছে — আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন' পুঁটি বলিল — আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

— ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এক্ষুনি ধরে উঠবে....

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন — স'রে এসে বোস মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়ঙ্গ

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল .... খোলা আগুণে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিলঙ্গ.....

পুঁটি বলিল — মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে ষাঁড়া ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসিঙ্গ

অন্নপূর্ণা বলিলেন — একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যাঙ্গ

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছেঙ্গ....

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইলঙ্গ পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিলঙ্গ তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলঙ্গ....

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন — দিলি?

পুঁটি বলিল — হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চালা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলঙ্গ পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ... রাতও তখন খুব বেশিঙ্গ.... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে ... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল — দিদি বড় ভালোবাসত.....

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলঙ্গ তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপন-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.... সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সম ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুরঙ্গ

৩৯.৫ সারাংশ

'পুঁইমাচা' অত্যন্ত সাদামাটাভাবে লেখা একটি গল্প — যা বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব স্টাইল বা শৈলীঙ্গ এই কাহিনীর বিষয়বস্তু খুব ব্যাপক কিছু নয়ঙ্গ দরিদ্র গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারের খাদ্যলোভী এক কিশোরীর জীবনের কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি আর বিয়ের পরে তার অকাল বিয়োগের করুণ স্মৃতিচারণা — এই হল গল্পের বিষয়বস্তুঙ্গ গরিব গৃহস্থ সহায়হরি চাটুয্যে এবং অন্নপূর্ণার তিন মেয়ের মধ্যে ক্ষেন্তিই বড়ঙ্গ সারাদিন এথা-ওথা ঘুরে বেড়ায়, খাবারদাবার কী পাওয়া যায় তারই খোঁজেঙ্গ পনেরো বছর বয়স হলেও (সেকালীন বাঙালি গ্রাম্য সমাজের প্রথাকে বজায় না রেখে) এখনও তার বিয়ে হয়নিঙ্গ সম্বন্ধ হয়ে, আশীর্বাদ হবার পর একটা বিয়ে ভেঙে গেছে পাত্রের চরিত্রদোষের খবর আসায়ঙ্গ এ নিয়ে গাঁয়ে ঘোঁট পাকায় কর্মহীন, ছিদ্রান্বেষী মাতব্বরেরাঙ্গ পিতা এবং কন্যা এতে নির্বিকার থাকলেও মায়ের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেঙ্গ

গল্পের শুরু হয়েছে, সহায়হরি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গাছকাটা-খেজুর রস সংগ্রহের জন্য উৎসাহ সহকারে যাবার উদ্যোগ করার জন্য স্ত্রীর কাছে ভর্ৎসিত হবার পটভূমিকায়ঙ্গ ঠিক সেই সময়েই ক্ষেন্তির আবির্ভাব আরেক প্রতিবেশী বাগানের জঞ্জাল হিসেবে ফেলে দেওয়া একরাশ পাকা পুঁইডাটা এবং ধার করে চেয়ে আনা একমুঠো কুচো চিংড়ি নিয়ে, সে। ছোট চোনা পুঁটিঙ্গ ক্রুদ্ধা মায়ের তিরস্কারে দুই কন্যা খিড়কির পুকুরের ধারে পুঁইডাটার বোঝা ফেলে দিয়ে এলে, সমস্যাটা তখনকার মতো মিটলঙ্গ

অন্নপূর্ণা মেয়েকে যতই তিরস্কার করুন, হাজার হোক মাতৃহৃদয় — দুপুরবেলায় সবার অগোচরে 'পাঁদাড়ে-ফেলা' ঐ পুঁইশাকেরই খানিকটা আবার উদ্ধার করে এনে, রান্না করে যথা সময়ে স্বামী-কন্যার পাতে সেই চচ্চড়ি পরিবেশন করলে ক্ষেন্তির মুখে হাসি ফুটে ওঠেঙ্গ... এইভাবেই দুঃখের ভাত সুখ করে খেয়ে দিন কাটে চাটুয্যে পরিবারেরঙ্গ কখনো বাবাতে-মেয়েতে লুকিয়ে অন্যের পোড়ো বাগানের জংলা জমির তলা থেকে বিশসেরী মেটে আলু তুলে এনে অন্নপূর্ণার কাছে ভর্ৎসিত হয়ঙ্গ কখনো বা, পৌষ-পার্বনের দিনে, দুঃখের সংসারে হাসি ফোটে পিঠে, পাটিসাপ্টা তৈরি হলেঙ্গ এরই মধ্যে ভাঙা পাঁচিলের ধারে ফেলে দেওয়া সেই পুঁইশাকের ডাঁটা থেকে একটি শীর্ণ পুঁইচারা জন্মালে তিন মেয়ের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে নাঙ্গ

পরের বৈশাখে ক্ষেন্তির পাত্র জোটেঙ্গ তার বর বছর চল্লিশ বয়সের দোজবরে হলেও পাত্র হিসেবে পাঁচজনের বিচারে ভাল বলেই গণ্য হয়, ''ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি'' করেছে সেঙ্গ কিন্তু বরপণের আড়াইশো টাকা বকেয়া পড়ে থাকায় ক্ষেন্তির সমাদর মেলেনি শ্বশুরবাড়িতে, বাপের বাড়িতেও তার আসা হয়নি আরঙ্গ সহায়হরি মেয়েকে দেখতে গিয়ে কুটুমবাড়িতে অসম্মানিতও হন তাঁর দারিদ্র্যের কারণেঙ্গ

বছরখানেকের মধ্যেই বসন্তরোগে ক্ষেন্তির জীবনাবসান ঘটলঙ্গ নির্মম শ্বশুরকুলের লোকেরা তার দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়িতে রোগাক্রান্ত অসহায় মেয়েটাকে ফেলে রেখে যায়, সহায়হরিকে কোনও খবর-টবর না দিয়েইঙ্গ গায়ের সোনা গয়নাগুলোও খুলে রেখে দেয় ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ির লোকজনঙ্গ

আবার ঘুরে আসে পৌষপার্বণের তিথিঙ্গ বড় মেয়ের বিয়োগব্যথা বুকে জমিয়ে রেখেই অন্নপূর্ণা এবারও পিঠে গড়তে বসেন দুই মেয়েকে নিয়েঙ্গ তিনজনেরই মন হু-হু করে ক্ষেন্তির কথা ভেবেঙ্গ তারপর উঠোনের এক কোণে নজর গিয়ে পড়ে, যেখানে ক্ষেন্তির হাতে পোঁতা সেই পুঁইচারাটি এতদিনে মাচা জুড়ে বেড়ে উঠেছে... ''বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশিরে'' পরিপুষ্ট হয়ে, মাচা থেকে ঝুলে পড়ে কচি সবুজ পুঁই ডগাগুলি দুলছে, ''সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' হয়েঙ্গ সেটি শুধু ক্ষেন্তির স্মৃতির সংকেতবাহী নয়, যেন তারই প্রতিরূপা হয়ে উদ্‌ভাসিত হয়েছেঙ্গ

৩৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

'পুঁইমাচা' গল্পের ক্ষেন্তির মধ্যে অনেক সমালোচকই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দুর্গার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেনঙ্গ এখালে বলা ভাল যে, 'পথের পাঁচালী' প্রথমে যখন লেখা হয়, তখন দুর্গার চরিত্র সেখানে ছিল নাঙ্গ আকস্মিকভাবে দুর্গার মতন একটি কিশোরী মেয়েকে প্রত্যক্ষ করে, বিভূতিভূষণ তাকেই দুর্গার প্রত্নপ্রতিমা (বা আর্কিটাইপ; কোনও সৃস্টির প্রথম কাঠামো) হিসেবে গ্রহণ করে চরিত্রটিকে গড়ে তোলেনঙ্গ ঠিক একই রকমের অভাবী গৃহস্থ পরিবারের ছন্নছাড়া, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ধরনের মেয়ে, খাদ্যে আসক্তি অপরিমিত; স্বভাবটি নম্র; মায়ের স্নেহ, শাসনকে মান্য করে এবং অল্প বয়সেই জীবনাবসান ঘটে ক্ষেন্তি এবং দুর্গা উভয়েরইঙ্গ প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে। দুর্গার মতোই ক্ষেন্তিও ওতঃপ্রোতভাবেই যেন জড়িয়ে থাকেঙ্গ ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পুঁইমাচা' প্রকাশিত হয়; এর কিছু দিন আগে থেকে 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু করেন বিভূতিভূষণঙ্গ পরবর্তী সময়ে দুর্গর চরিত্রটি 'পথের পাঁচালী'তে সন্নিবিষ্ট করার আগে, 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে তার একটা পূর্ব-প্রতিভাস ক্ষেন্তির চরিত্রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে নাঙ্গ

গ্রামের মানুষ এবং তাঁদের নিত্যদিনের শোক সুখ, অভাব-আনন্দ, হীনতা - মহত্ত্ব — বিভূতিভূষণের লেখার এই হল অন্যতম প্রধান উপজীব্যঙ্গ 'পুঁইমাচা'-ও এই সীমানারই অন্তর্বর্তীঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে। মানুষের একটি নিবিড় — নৈকট্যও তাঁর উপন্যাস এবং গল্পের আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণঙ্গ 'পুঁইমাচা'-য় সেটিও প্রত্যক্ষ করা যায়ঙ্গ কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পের একটা অনন্যতা রয়েছে — যা ঐ প্রকৃতি তন্ময়তার মধ্যেও ভিন্নতর এক মাত্রাবিন্যাস করেছেঙ্গ গল্পের শেষে যে বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ঐ পুঁইমাচাটির — সেটি এখানে স্মরণযোগ্য ঃ ''সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুরঙ্গ'' এরই পাশাপাশি গ্রাম্য সমাজের ছবিটাও নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে 'পুঁইমাচা' গল্পেঙ্গ ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রী 'গাঁওবুড়ো'-দের নিখুঁতভাবেই তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণঙ্গ অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্নতা, অশিক্ষা এবং কূপমণ্ডুকতা — এই তিনে মিলে প্রায় 'ত্র্যহস্পর্শ' যোগ ঘটেছে সেখানেঙ্গ ক্ষেন্তির বিয়ের আশীর্বাদ হবার পরেও পাত্রের দুশ্চরিত্রতার খবর পেয়ে সহায়হরি যে, আর এগোলেন না ঐ সম্বন্ধের সূত্রে — এতে কিন্তু আবার তার ব্যক্তিত্বেরও একটা হদিশ মেলে, মূল্যবোধেরওঙ্গ এর ফলে গ্রাম্য মোড়লদের বৈঠকে তাঁকে তিরস্কৃতও হতে হয়, যদিও তার পিছনে ছিল কালীময় মজুমদার প্রমুখের ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থহানি হবার কারণজাত আক্রোশই (ঐ লম্পট পাত্রটির বাবার কাছে তিনি ঋণ করে রেখেছিলেন, ক্ষেন্তির সঙ্গে। সে-হেন অপাত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তিনি কিছুটা সুবিধে পেতেই সচেষ্ট ছিলেন, এই আর কি!) আবার এই গ্রাম্য সমাজেই দীনদরিদ্র গয়া বুড়ির মতো নারীকেও দেখা যায়, যিনি কোনও দিন দাম শোধ হবে না জেনেও ছেলেমানুষ ক্ষেন্তিকে এক মুঠো কুচো চিংড়ি দেন তার তরিবৎ করে পুঁইশাক খাওয়ার সাধ মেটাতেঙ্গ পাড়াপড়শির মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব বিবাদ যাইই থাক — একজনের সুখে-দুঃখে আরেকজন পাশে এসে দাঁড়ায়ও সর্বদাঙ্গ এই সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ এমনভাবে তার চিত্রায়ণ করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু এই গল্পেই নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মেইঙ্গ

প্রধান চরিত্র তিনটির মধ্যে সহায়হরি এবং অন্নাপূর্ণার মানসিক প্রবণতার কিছুটা পরিচয় উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া গেছেঙ্গ সহায়হরি দরিদ্র, কিন্তু আত্মসম্মানহীন ননঙ্গ লুকিয়ে পরের বাগান থেকে মেটে আলু চুরি করতে কিংবা স্বচ্ছল প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে খেজুর রস চেয়ে আনতে যেমন তিনি কুণ্ঠাহীন, ঠিক তেমনই আবার পিতৃস্নেহে এবং চরিত্রগত মূল্যবোধের জন্য তিনি শ্রদ্ধার্হঙ্গ ক্ষেন্তির প্রথম সম্বন্ধটি ভেঙে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর এই দুটি প্রবণতাই একত্রে মিলে গিয়ে ঐ সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে ক্ষমতা জুগিয়েছেঙ্গ স্ত্রীর স।ত তিরস্কারের সামনে আমতা-আমতা করলেও, সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার মতো মনোবল তাঁর ছিলঙ্গ আবার দারিদ্র্যের কারণে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অপমানিত হলেও কোনও প্রতিবাদের ভাষা তাঁর মুখে জোগায় নাঙ্গ জামাইবাড়ির লোকেদের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতায় আদরিণী কন্যার মৃত্যু ঘটলে তিনি মর্মান্তিক বেদনা পান ঠিকই, কিন্তু তার অল্পদিন পরেই আবার বন্ধুর সে। মাছ ধরতে যাবার তোড়জোড়ও করতে দেখা যায় সহায়হরিকেঙ্গ আসলে এই মানুষটি নানা ধরনের বৈপরীত্যের সমাহারে তৈরিঙ্গ তাই এঁকে পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই করা যায় নাঙ্গ আবার পার্শ্বচরিত্র হিসেবে গণ্য করে উপেক্ষা করাও তাঁকে অসম্ভবঙ্গ নীতিবোধ কখনো দুর্বল; কখনো প্রবল; কোনো সময়ে ব্যক্তিত্বহীনতায় গ্রস্ত, কখনো বা ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলপ্রভ; কখনো দুঃখে-আনন্দে সচকিত — কখনো নিরাসক্ত, নির্বেদনে স্বস্থঙ্গ ফলত, এইসব বহুমাত্রিক বৈপরীত্য তাঁর চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছেঙ্গ

অন্নপূর্ণা চরিত্রটি পক্ষান্তরে একমাত্রিকঙ্গ শুধু ক্ষেন্তিই দুর্গার পূর্বপ্রতিমা (বা, আর্কিটাইপ) নয়, অন্নপূর্ণাকেও সর্বজয়ার প্রতিকল্প বলে স্বচ্ছন্দেই মনে করা যায়ঙ্গ দরিদ্রের সংসারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে পাঁচটি প্রাণীর উদরান্নের জোগাড় করা যে কী দুঃসাধ্য দায়িত্ব তা হয়ত তিনিই জানেনঙ্গ দারিদ্র্যের কারণে সঞ্জাত স্বামী-কন্যার ঐ খাদ্যলোলুপ স্বভাবের প্রতি তিনি বিরক্তঙ্গ অথচ মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক অনুভবও তাঁর চরিত্রের মধ্যে সুনিবিড়ঙ্গ পরের বাগানের 'ফেলে দেওয়া জঞ্জাল' কুড়িয়ে আনার জন্য কিংবা মেটে আলু চুরি করার জন্য তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হন, তেমনই আবার রাগ করে ফেলে দেওয়া পুঁই ডাঁটারই চচ্চড়ি রেঁধে লোভাতুর কন্যার পাতে তুলে দিয়ে তিনি তৃপ্তি পানঙ্গ মেয়ের স্বভাবের মধ্যে ঐ খাদ্যলোলুপতাটুকু ছাড়া আর কোনো বিচ্যুতিই যে নেই, তা আর তাঁর চেয়ে বেশি কে বোঝে ''ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবেঙ্গ এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও টুঁ শব্দটি মুখে নেইঙ্গ উঁচু কথাটি কখনো কেউ শোনেনি''ঙ্গ ঠিক এই কারণেই শঙ্কিতবক্ষে তিনি মেয়ে শ্বশুরঘর করতে পাঠাবার সময়ে ভেবেছেন ''ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?''

পরের বছরের পৌষ-পার্বনের দিনে সন্ধ্যার পরে ছোট দুই কন্যাকে নিয়ে পিঠে গড়তে বসে তাই তাঁর চিন্তার মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে মৃতা জ্যেষ্ঠা দুহিতার বেদনাময় স্মৃতিঙ্গ তার নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটির মাচাভরা বিস্তৃতি দেখে যেন সেই তৃণগুল্মের সতেজ, সবুজ ভাবটুকুর মধ্যেই প্রয়াতা কন্যার কৈশোর-লাবণ্যকে অনুভব করেন অন্নপূর্ণাঙ্গ সেই খাদ্যলোলুপ, শান্ত স্বভাবের, ভীরু, অগোছালো কন্যাটির বিয়োগের পরেও যেন তিনি তাকে, তার স্মৃতিমেদুর অলক্ষ্য অস্তিত্বকে খুঁজে পান সেখানেঙ্গ বাস্তবে-কল্পনায় এভাবে মেশামিশি হবে তাঁর স্নেহকরুণ মাতৃহৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেঙ্গ

ক্ষেন্তির চরিত্রটি অবশ্যই অভিনব নয়ঙ্গ বারংবার দুর্গার কথা তার প্রসে। মনে পড়বেইঙ্গ তার খাদ্যলোভ স্বভাবগত ঠিকই, কিন্তু মূল উৎসটা দারিদ্র্যইঙ্গ ঠিক একই কথা 'পথের পাঁচালী'-র মধ্যে অনেকবারই বলেছেন বিভূতিভূষণ — এখানেও সেটি নানান্ ব্যঞ্জনায় তিনি ব্যক্ত করেছেনেঙ্গ তাই ক্ষেন্তির এই দোষটি তাকে সামান্য মেটে আলুর মতো তুচ্ছ বস্তু চুরি করতেও প্ররোচনা দিয়েছেঙ্গ (অবশ্য সেই অপকর্মে সে ছিল তার বাবার

সহকারিনী মাত্র!) ক্ষেন্তির শান্ত, অগোছালো, লাজুক এবং ভীরু স্বভাবটির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার ট্র্যাজেডির রন্ধ্রপথঙ্গ বরপণ ইত্যাদি সব সামাজিক অনাচার, অপহ্নব সেই ট্র্যাজেডির উৎস হলেও, নিজের স্নিগ্ধ স্বভাবটির জন্যই সে প্রতিবাদ করতে শেখেনি এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, অবিচারের শিকার হয়েছে তার ফলেঙ্গ খাদ্যলোলুপতা ক্ষেন্তির জীবনের একমাত্র ত্রুটি, কিন্তু সেটাও বিভূতিভূষণের লেখার গুণে ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠেছেঙ্গ ফলে, সরল এবং শান্ত এই গ্রাম্য কিশোরীটিও বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার মতোই পণপ্রথার শিকার হয়ে উঠেছেঙ্গ

'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য সেভাবে কিছু অবশ্য নেইঙ্গ দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও পারিবারিক অবিচার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প রচিত হয়েছেঙ্গ এই গল্পের উল্লেখযোগ্যতা অন্যত্রঙ্গ প্রকৃতি ও মানুষে নিবিড় একটি সম্পর্ক বিভূতিভূষণের লেখায় বহু-বহুবারই দেখতে পেয়েছি আমরাঙ্গ কিন্তু কাহিনীর পরিণামে সতেজ, লাবণ্যময় পুঁই মাচাটির বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে কিশোরী ক্ষেন্তির স্মৃতিময় রূপটি মিশে একাকার হয়ে গিয়ে যে বিচিত্র রসানুভূতির সঞ্জনন ঘটেছে, তা কিন্তু বাস্তবিকই তুলনাবিরলঙ্গ এই অন্যস্বতন্ত্র অনুভবের কারণেই এই গল্প এত সাধারণভাবে শুরু এবং বিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও, পরিণামে এমন শিল্পঋদ্ধি অর্জন করেছেঙ্গ 'পুঁইমাচা' নামটির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যও সেখানেই নির্হিতঙ্গ

৩৯.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) 'পুঁইমাচা' গল্পটি নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানঙ্গ

২) ক্ষেন্তি এবং অন্নপূর্ণা, যথাক্রমে দুর্গা এবং সর্বজয়ার পূর্বপ্রতিমা কি-না আলোচনা করুনঙ্গ

৩) ''মানুষ এবং প্রকৃতি বিভূতিভূষণের লেখায় খুব ঘনিষ্ঠ এক তন্ময়-সম্পর্কে নিবিড় হয়ে থাকে; কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছেঙ্গ'' — এই মন্তব্যের যাথার্থ্য আলোচনা করুনঙ্গ

৪) বাংলার পল্লীসমাজের কুচক্রী পটভূমি একদিকে, অন্যদিকে সহজ সরল প্রতিবেশী বৎসল প্রেক্ষিত — এ-দুটিই এ-গল্পে কেমন করে সহাবস্থান করেছে আলোচনা করুনঙ্গ

৫) ''ক্ষেন্তি এবং অন্নপূর্ণা বিভূতিভূষণের লেখায় টাইপ-চরিত্র হলেও, সহায়হরি কিন্তু তা ননঙ্গ'' — একথা কতদূর মান্য আলোচনা করুনঙ্গ

৬) এই কাহিনী ট্র্যাজেডি হলেও — এর মধ্যে একটি সমাহিতভাব অনুভূত হয় কী ভাবে, আলোচনা করুনঙ্গ

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ক্ষেন্তির প্রথমবারে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল কী কারণে?

২) ফেলে দেবার পরেও অন্নপূর্ণা পুঁইডাটা তুলে এনে চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন কেন?

৩) মেটে আলু তুলে আনা নিয়ে সহায়হরি এবং অন্নপূর্ণার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল?

৪) পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যায় চাটুয্যেবাড়িতে পাটিসাপটা তৈরি করা নিয়ে যে কথাবার্তা হয়, তার তাৎপর্য কী?

৫) অন্নপূর্ণ কেন চিন্তিত হয়েছিলেন ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে?

৬) পুঁইমাচাটি অন্নপূর্ণা এবং তাঁর ছোট দুই মেয়ের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল?

□ সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) সহায়হরি কার কাছে থেকে রস আনতে যেতে চাইছিলেন?

২) ক্ষেন্তিকে পুঁই ডাঁটা কে দিয়েছিলেন?

৩) চিংড়ি মাছ ক্ষেন্তি কার কাছ থেকে পেয়েছিল?

৪) কার ''বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়''?

৫) কোন্ গাঁয়ের কার ছেলের সে। ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েও ভেঙে গিয়েছিল?

৬) মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকীর নাম কী?

৭) মেটে আলু কোথায় পোঁতা ছিল?

৮) চৌকিদারের নাম কী?

৯) ক্ষেন্তির জামা কত টাকায় কেনা হয়েছিল?

১০) ক্ষেন্তির বর কিসের ব্যবসা করতেন?

১১) সহায়হরি ''বিখ্যাত' পূর্বপুরুষের নাম কী?

১২) ক্ষেন্তির বরপণ কত বাকি ছিল?

১৩) সহায়হরি কার সে। মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছিলেন?

১৪) ক্ষেন্তির মৃত্যু কোথায় হয়েছিল?

১৫) 'ষাঁড়া ষষ্ঠী' কোথায় অধিষ্ঠান করেন?

১৬) পুঁটি ও রাধী কোথায় পিঠে ছুঁড়ে দিয়েছিল?

১৭) ষাঁড়া ষষ্ঠীর উদ্দেশে পিঠে ফেলার সময় কে পালিয়ে গিয়েছিল?

১৮) পৌসপার্বণের রাত্রে কোন্ পাখি ডাকছিল?

৩৯.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসাি আলোচনা ও গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ অনুসরণে উত্তর করুনঙ্গ

২) প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদির (৬৩.৬) প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর করুনঙ্গ

৩) প্রস্তাবনা এবং প্রাসাঙ্গিক আলোচনার শেষাংশ বার বার পড়ে উত্তর তৈরী করুনঙ্গ

৪) গল্পটি ভাল করে পড়ে প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণের সাহায্যে উত্তর দিনঙ্গ

৫) ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও ভাব-রস বিশ্লেষণ করে আলোচ্য গল্পের রসপরিণতি প্রাসাঙ্গিক আলোচনা অবলম্বনে বুঝিয়ে দিয়ে উত্তর লিখুনঙ্গ

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) ক্ষেন্তির বিয়ের প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল, শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বাবা টের পান পাত্রটি স্বগ্রামে কি একটা করবার ফলে জনৈক কুম্ভকার বধুর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহারে শয্যাগত ছিলঙ্গ এরকর পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না বলে সহায়হরি সম্বন্ধ ভেঙে দেনঙ্গ

২) ক্ষেন্তির আনা পুঁই-ডাটা ফেলে দেবার পর অন্নপূর্ণার রাঁধতে রাঁধতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এও মনে পড়ে যে অরন্ধনের পূর্বদিন পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করে বলেছিলঙ্গ ''মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদেরঙ্গ'' তিনি নিজেই স্নেহের টানে উঠান ও খিড়কী থেকে ডাঁটা কুড়িয়ে এনে কুঁচো চিংড়ি দিয়ে চুপি চুপি তরকারী রেঁধেছিলেনঙ্গ

৩) সহায়হরি পনেরো-ষোল সের ভারী মেটে আলু ঘাড়ে করে নিয়ে এসে, স্ত্রীকে দেখে কৈফিয়ত হিসেবে বলে, ময়শা চৌকিদার তাঁকে দিয়েছেঙ্গ অন্নপূর্ণা বরোজপোতার বন থেকে চুরি করে আনার অভিযোগ করেনঙ্গ সহায়হরি অস্বীকার করতে সচেষ্ট দেখে, তিনি অনুযোগ করে বলেন যে তার ইহকাল-পরকাল তো গেছেই, চুরি-ডাকাতি করতে ইচ্ছে হয় করুনঙ্গ কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে নেওয়া কেনঙ্গ

৪) পৌষ-সংক্রান্তির দিন পাটি-সাপটা তৈরী করার যে বর্ণনা আছে, তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করুনঙ্গ

৫) ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাবার সময় তার বুক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিকমত বুঝবেঙ্গ

৬) পৌষ সংক্রান্তির জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে অন্নপূর্ণা ও তাঁর দুই মেয়ের যখন পিঠে গড়া প্রায় শেষ -দুই বোনের খাওয়ার জন্য যখন কলার পাতা ছিড়ছেঙ্গ পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে — ''দিদি বড় ভাল বাসতঙ্গ'' এরপর তিনজনই কেমন যেন আচ্চৰন হয়ে পড়েঙ্গ লোভী মেয়েটির স্মৃতি তাদের আচ্ছন্ন করে নজর পড়ে ক্ষেন্তির হাতে সাধের পুঁই গাছটি — মাচাটি জুড়ে রয়েছে গাছটি — সে যেন পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়িয়ে রয়েছেঙ্গ সে বেড়ে উঠেছে — বর্ষার জল আর কার্তিক মাসের শিশিরেঙ্গ তার কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে ধরেনিঙ্গ মাচার বাইরে দুলছে, সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুরঙ্গ

সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজনঙ্গ মূলপাঠ ভাল করে পরে একটি বাক্য উত্তর করুনঙ্গ

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্য — *শ্রেষ্ঠ গল্প*

২) ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — *বিভূতিভূষণ ঃ মন ও শিল্প*

৩) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রস। ও প্রকরণ*

৪) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার*

৫) নারায়ণ গোপাধ্যায় — *বাংলা গল্প বিচিত্রা*

৬) নারায়ণ গোপাধ্যায় — *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*

একক ৪০ ❑ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারিণী মাঝি

গঠন

৪০.১ উদ্দেশ্য

৪০.২ প্রস্তাবনা

৪০.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৪০.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

৪০.৫ সারাংশ

৪০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৪০.৭ অনুশীলনী

৪০.৮ উত্তরমালা

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.১ উদ্দেশ্য

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন কথা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বঙ্গ তিনি গল্প ও উপনযাস দুটি ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীঙ্গ 'কল্লোল' পত্রিকায় ছোট গল্প লিখেই তাঁর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুঙ্গ কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা উপন্যাসে গ্রাম বাংলাকে নিয়ে রচিত এপিকধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেনঙ্গ তথাপি রাঢ়ের গ্রামীণ প্রতিবেশে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলি শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রূপে গণ্যঙ্গ

'তারিণী মাঝি' এমনই একটি গল্পঙ্গ প্রসঙ্গে ও প্রকরণে তারাশংকরের এই গল্পটিকে অনেকটা আদিম মহাকাব্যধর্মী বলা যায়ঙ্গ এখানে তারিণী চরিত্রে যে আদিম জৈব-প্রবৃত্তির (elemental passion) পরিচয় পাওয়া যায়, তা মানুষের মৌলিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সহজাত উপাদানঙ্গ এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেইঙ্গ অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামের মত একে এড়িয়ে যাবার শক্তিও নেইঙ্গ প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি প্রেমনির্ভরতাকেও পরাভূত করেঙ্গ এ গলেপর এটিই ট্রাজেডিঙ্গ

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন —

১) 'তারিণী মাজি' চরিত্র প্রধান গল্পঙ্গ

২) গল্পটি বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিতঙ্গ

৩) ময়ুরাক্ষী নদী এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র তারিণী মাঝি ও তার স্ত্রী সুখীর সঙ্গে সমান গুরুব পেয়েছেঙ্গ ময়ূরাক্ষীর জীবন্ত, দুর্দান্ত স্বভাবের বর্ণনা তাকে এখানে অনেকটা সজীব ও স্বতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেঙ্গ

৪) এই গল্পে দেখান হয়েছে প্রেম ও প্রাণশক্তির মূলগত ভেদ আছেঙ্গ

৫) গল্পটির আপনি লক্ষ্য করবেন মানুষের প্রেম ও প্রাণশক্তির দ্বন্দ্বে, প্রাণের দাবীই প্রধানঙ্গ মানুষের আদিম অসংস্কৃত জৈব প্রবৃত্তিই একান্তভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়ঙ্গ এই বাঁচার তাগিদে অপরকে পাশবিকভাবে হত্যা করলেও সে পরাঙ্মুখ হয় নাঙ্গ

৬) গল্পটিতে আপনি বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী-তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের বিশেষ ভাষা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাবেনঙ্গ লেখকের ভাষা গঠনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, গল্পের ভাষার নিরাসক্ত, নির্মম ও অমোঘ রূপের মধ্যেঙ্গ ভাষা একান্তভাবেই চরিত্রানুসারীঙ্গ

৪০.২ প্রস্তাবনা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়ঙ্গ 'তারিণী মাঝি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প — প্রকাশ ১৩৩৫-এর পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার'-এঙ্গ রচনাটি তারাশংকরের জীবন ভাবনা ও শিল্প কর্মের উজ্জ্বল উদাহরণঙ্গ তিনি বস্তুতঃ জীবনের স্বভাবধর্মকে বুঝতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাঢ়ের পরিচিত প্রতিবেশে লালিত নিরক্ষর, অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনা ভরপুর মানব মানবীকে আশ্রয় করেছেনঙ্গ তাই তাঁর কাহিনীবৃত্ত নিটোল, বাহুল্য বর্জিত, পরিমিত ও সংযত; চরিত্রগুলি রাঢ়ের শুষ্ক রাঙামাটির মত অনেক সময় আদি অসংস্কৃত, জৈবপ্রকৃতির অনুসারী —ভালমন্দের বিচার রহিতঙ্গ গল্পকার তারাশংকরের এটি নিজস্ব ক্ষেত্রঙ্গ বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে অভিনব ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদঙ্গ

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে জৈবিক তাড়না ও মানবিক বোধ এই দুয়ের দ্বন্দ্বে যে বিশাল জল সমাজকে তারাশংকর প্রত্যক্ষ করেছিলেন — তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি 'তারিণী মাঝি'ঙ্গ

গল্পটি পাঠ করার পর প্রাসাি আলোচনার সাহায্যে আপনি গল্পের প্রকৃত মর্মবস্তু যথাযথ অনুধাবন করতে পারবেনঙ্গ

৪০.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৭.১৮৯৮ — ১৪.৯.১৯৭১) জন্মেছিলেন বীরভূমের লাভপুরে গ্রামের একটি মধ্যবর্গীয় ভূস্বামী পরিবারেঙ্গ তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, আয় ছিল সামান্যইঙ্গ তিনি ছিলেন এই শ্রেণীর এক অন্তিম প্রতিনিধিঙ্গ

গ্রামীণ পরিবেশে তারাশংকর তাঁর শৈশব-কৈশোরের পাঠ সা। করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেনঙ্গ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেওয়ায় ১৯২১-এর তিনি অন্তরীণ হনঙ্গ াবার ১৯৩০-এ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ায় কারারুদ্ধ হনঙ্গ জেল থেকে বেরিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে কিছুদিন কয়লার ব্যবসা, পরে কানপুরে চাকরী নিয়ে যানঙ্গ এ সব কাজে মন বসেনিঙ্গ পরিশেষে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত নেনঙ্গ আমৃত্যু সাহিত্যই ছিল তাঁর অবলম্বনঙ্গ দক্ষিণ পূর্ব বীরভূমের আঞ্চলিক প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা জীবন ছিল তাঁর সিদ্ধকাম সৃষ্টির প্রেরণাঙ্গ তাই গ্রাম বাংলার বিশেষত রাঢ়ভূমির মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁর লেখায় ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করে রেখেছেঙ্গ সমাজ

ও পরিবার —এই দুটি প্রেক্ষিতেই তাঁর কাহিনীগুচ্ছের উপকরণ; কিন্তু মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় আলোছায়াময় অসংখ্য স্তরকেও তিনি অন্বেষণ করে কাহিনীর ভাবরূপকে গড়ে তুলেছেনঙ্গ নিজের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সে। যুক্ত ছিলেন বলেও সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি পৌঁছনোর সুযোগ তাঁর হয়েছিলঙ্গ

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার — দুই পরিচয়েই তিনি প্রথিতযশাঙ্গ তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুরঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কবি', 'অভিযান', 'রাইকমল', 'রাধা', 'বিচারক', 'অরণ্যবহ্নি'—ইত্যাদিরঙ্গ আর তাঁর ছোটগল্পের মোট সংখ্যা ১৯০টিঙ্গ এগুলির মধ্যে সুপরিচিত ও বহু-আলোচিত অনেক কটিই; যেমন ঃ 'রসকলি', 'মালা-চন্দন', 'জলসাঘর', 'বন্দিনী কমলা', 'রায়বাড়ি', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'না', 'জটায়ু', 'কালাপাহাড়', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার',—ইত্যাদিঙ্গ মোট ৩৫টি গ্রন্থে এগুলি বিধৃত আছেঙ্গ 'রসকলি', 'জলসাঘর', 'শিলাসন', 'পৌষলক্ষ্মী', 'হারানো সুর', 'দীপার প্রেম' ইত্যাদি এদের মধ্যে উল্লেখ্যঙ্গ

তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এক-অর্থে চলমান ইতিহাসের ছবি যেমন বিম্বিত হয়েছে, তেমনই আবার মানুষের মনের বহুবিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণও তার মধ্যে রূপান্বিত হয়েছেঙ্গ ফলত, জীবনের প্রেক্ষাপট এবং অন্তর্লোক— দুইই তাঁর লেখার মধ্যে বিপুল প্রতীতি নিয়ে উপস্থিত আছেঙ্গ এই বিশাল ব্যপ্তির জন্যই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অত্যন্ত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকেঙ্গ

তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করেনঙ্গ তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিও দেওয়া হয়ঙ্গ তিনি বিধানসভার সদস্য, লোকসভার মনোনীত সদস্যও ছিলেনঙ্গ

৪০.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলাঙ্গ অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছেঙ্গ কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজাঙ্গ তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামেঙ্গ

আষাঢ় মাসঙ্গ অম্বুবাচী উপলক্ষে ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ময়ূরাক্ষীর গণুটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিলঙ্গ পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়ঙ্গ

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাকরুণরা, আর লয়ঙ্গ গ।াচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সবঙ্গ

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি নোক বাবা, এই ছেলেটিঙ্গ ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়ঙ্গ দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে নাঙ্গ

সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিলঙ্গ সে বলিল, তোরা যা, আসছে খেপে আমরা সব একসে। যাবঙ্গ

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই খেপেই চাপঙ্গ তোমরা সব একসে। চাপলে ডোঙা ডুববেইঙ্গ মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়িদের খেপেই ডুববে মাঝিঙ্গ কেউ দশ বার, কেউ বিশ বার গ।াচান করেছে ওরাঙ্গ আমাদের সবে এই একবারঙ্গ

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সবঙ্গ যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিলঙ্গ মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িলঙ্গ তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিলঙ্গ সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো কেউ, দেখ, এখনও দেখঙ্গ — বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িলঙ্গ লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব — হরিবোলঙ্গ যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল — হরিবোলঙ্গ দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিলঙ্গ নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রুর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছেঙ্গ তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছিঙ্গ

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবাঙ্গ তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে — এঁটে ধর্ দাঁড়, হ্যাঁ — সেঙাত, আমার ভাত খায় না গো! টান দেখছিস্ না?

সত্য কথা, ময়ূরাক্ষীর এই খরস্রোতই বিশেষত্বঙ্গ বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করেঙ্গ কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্কারীঙ্গ দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পি।লবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলেঙ্গ আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া-মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়ঙ্গ কিন্তু সে সচরাচর হয় নাঙ্গ বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিলঙ্গ

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিলঙ্গ একজন পুরুষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিলঙ্গ

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও নাঙ্গ তুমিই উড়ে যাবাঙ্গ

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া দিলঙ্গ সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল — আর্ত কলরবঙ্গ

ডোঙার যাত্রী সব সচকিত হইয়া পড়িলঙ্গ তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুঁশ করে! তোমাদের কিছু হয় নাইঙ্গ ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটেঙ্গ এই বুড়ি মা, কাঁপছ কেনে, ধর ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধরঙ্গ ভয় কি? এই দেখ আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছিঙ্গ

নদীও শেষ হইয়া আসিয়াছিলঙ্গ

তারিণী বলিল, কেলে!

কী?

নদীবক্ষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর্ দেখিঙ্গ

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িলঙ্গ তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই — দেখ — হুই — হুই ডুবিলঙ্গ বলিতে বলিতে সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িলঙ্গ ডোঙার উপর কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবাঙ্গ

কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, এই বুড়িয়া পেছু ডাকে দেখ দেখিঙ্গ মরবি মরবি, তোরা মরবিঙ্গ

পি।লবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূর গিয়া ভাসিয়া

উঠিতেছিলঙ্গ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তারিণী ক্ষিপ্তগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিলঙ্গ সে চলার মধেয যেন কত স্বচ্ছন্দ গতিঙ্গ বস্তুটার নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছিলঙ্গ কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিলঙ্গ সে। সে। তারিণীও ডুবিলঙ্গ দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিলঙ্গ এক হাতে তাহার ঘন কালো রঙের কি রহিয়াছেঙ্গ তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিলঙ্গ

দুই তীরের জনতা, আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে লক্ষ্য করিতেছিলঙ্গ এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোলঙ্গ

অন্য তীরের জনতা চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছিলঙ্গ

তারিণীর ভাগ্য ভালঙ্গ জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধুঙ্গ ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনারতা বধুটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিলঙ্গ অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিলঙ্গ মেয়েটি খানিকটা জল খাইয়াছিল কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয় — অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিলঙ্গ

নিতান্ত কচি মেয়ে — তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়; দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে — কানে মাকড়ি, নাকে টানাদেওয়া নথ, হাতে রুলি; গলায় হারঙ্গ সে তখনও হাঁপাইতেছিলঙ্গ অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেনঙ্গ

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, 'পেনাম ঘোষমশাইঙ্গ

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলঙ্গ

তারিণী কহিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও দম লাওঙ্গ সেই যে বলে — লাজে মা কুঁকড়ি, বেপদের ধুকুড়িঙ্গ

ঘোষমহাশয় বলিলেন, কী চাই তো তারিণী, বল?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কী তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল নাঙ্গ অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম — আট আনাঙ্গ

জনতার মধ্য হইতে সেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, অ মরণ আমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপুঙ্গ

তারিণী যেন এতক্ষণ খেয়াল হইল, সে হেঁটমাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ-মশাইঙ্গ

জনতার মধ্যে হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্তে জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিলঙ্গ

বধুটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল — রাঙা করতলের উপরে সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকঝক করিতেছেঙ্গ

ঘোষমহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে পাঁচ টাকাঙ্গ

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিল, আজ্ঞে হুজুর চাদরের বদলে যদি শাড়ি —

হাসিয়া ঘোষমহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবেঙ্গ

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণীঙ্গ

তারিণী বলিল, নেহাত কালো কুচ্ছিত মাঙ্গ

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়াঙ্গ এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেচিল ওখানেঙ্গ সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা — শুধুই — অ্যা —অ্যাই — একটো —

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁঙ্গ

তারিণী বলিল, জলাম্পয় — সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাইঙ্গ শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান স — ব সমানঙ্গ

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিলঙ্গ

গ্রামের প্রান্তেই বাড়িঙ্গ বাড়ির দরজায় একটা আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী — তারিণীর স্ত্রীঙ্গ

তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো — তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতে আমদানি —

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এসঙ্গ ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেলঙ্গ

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরাতে হবেঙ্গ লত কই — কই কোথা গেল শালার লত?

সুখী বলিল, কোন্ দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমিঙ্গ এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তুঙ্গ

তারিণী ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেনে, কি করলাম আমিঙ্গ

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি —

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিলঙ্গ হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল তু বল্ বলে যা বলছিঙ্গ পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতেঙ্গ জবাব দে কথার — অ্যাইঙ্গ

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেলঙ্গ

তারিণী ডাকিল, সুখী, অ্যাই সুখী, অ্যাই!

সুখী কোন উত্তর দিল নাঙ্গ তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিঙ্গৈ পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল, চল, এখুনি তোকে যেতে হবেঙ্গ

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়ঙ্গ

তারিণী বলিল, আলবত যেতে হবেঙ্গ হাজার বার — তিনশো বারঙ্গ

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড় — যাব, চলঙ্গ তারিনী খুশি হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিলঙ্গ সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেলঙ্গ

তারিণী বলিতেছিল, চল্ তোকে পিঠে নিয়ে ঝাপ দোব গনুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটেঙ্গ

সুখী বলিল, তাই যাব, ভাত খেয়ে লাও দেকিনঙ্গ

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত খাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিলঙ্গ

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তুলি নাই সেবার এক জোড়া গোরু? পনের টাকা — পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে নিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কী করে হল? বল্ কে — তোর কোন্ নানা দিলে?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার পক্ষে ভালঙ্গ তারিণী বলিল, শালা মদনা — লিলি ঠকিয়ে — লেঙ্গ সুখীর শাঁখাবাঁধা তো হয়েছে, ব্যস্ আমাকে দিস আর না দিস! পড়ে শালা একদিন ময়ূরাক্ষীর বাণে — শালাকে গোটা কতক চোবল দিয়ে তবে তুলিঙ্গ

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকাঙ্গ

সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু টাকা কই?

তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে — যা লিয়ে যাঙ্গ

সুখী এ কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভাস নয়ঙ্গ তারিণী আবার বকিতে শুরু করিল, সেবার সেই তোর যখন অসুখ হল, ডাক পার হয় না, পুলিস সাহেব ঘাটে বসে ভাপাইছে হুঁ হুঁ বাবা — সেই বকশিশে তোর কানের ফুলঙ্গ যা তু যা, এখুনি ডাক্ লদীর পার থেকে, এই, উঠে আয় হারামজাদা লদীঙ্গ উঠে আসবে, যা যাঙ্গ

সুখী বলিল, দাঁড়াও আয়নাটা লিয়ে আসি, লতটা পরি; তারিণী খুশি হইয়া নীরব হইলঙ্গ সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিলঙ্গ সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছেঙ্গ নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখিঙ্গ

সুখীর মুখে পুলকের আবেগ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিলঙ্গ

তারিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলঙ্গ সুখী তন্বী, সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাইঙ্গ

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাইঙ্গ ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাঙ্গ দশহারার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকেঙ্গ এবার তেরো শো বিয়াল্লিশ সালে দশহারার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চ্চনা করিতেছিলঙ্গ তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি — ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণীঙ্গ জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিলঙ্গ তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাইঙ্গ ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইলঙ্গ সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাল করে পূজো কর্ তারিণী, জল-টল হোক, বান-টান আসুক, বান না এলে চাষ হবে কি করে?

ময়ূরাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলেঙ্গ

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপুঙ্গ লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পূজো দেয়ঙ্গ এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মীঙ্গ ধর্ ধর্ কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল ধর্ঙ্গ

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভে উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল নাঙ্গ

পূজা অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেলঙ্গ তারিণী মদ খাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড় — কলকল — বান, লে কেনে তু দশদিন বাদঙ্গ

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি তু কিন্তুক ভাষা জিনিস ধরতে পাবি নাঙ্গ এবার কিন্তুক আমি ধরব, হ্যাঁঙ্গ

তারিণী মত্ত হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরণ-চাকে তিলেটি বুটবুটি, বুক — বুক — বুক, বাস্ — কালাচাঁদ ফরসাঙ্গ

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল, কি বললি শালা?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিলঙ্গ সে বলিল, ছোট বানের সময় — হুই পাকুরগাছ পর্যন্ত বানে দেওর ধরবে, আর পাকুরগাছ ছাড়লেই তুমিঙ্গ

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলো লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ লইলেই বলে কে?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল, দুইজনে হাতুড়ি নেয়ান লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্য পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নুতন করিয়া ফেলিলঙ্গ

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাল ধরিল রৌদ্রের টানেঙ্গ সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল নাঙ্গ বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল নাঙ্গ বৃষ্টি অতি সামান্য — দুই চারি পশলাঙ্গ সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিলঙ্গ প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিলঙ্গ কিংবা হয়তো বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এঙ্গ তারিণীর দিন আর চলে নাঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের বাইসিক্‌ল ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়ঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে — তাঁহারা আসেন দেশে সত্যই অভাব আছে কি না, তাহারই তদন্তেঙ্গ আরও কিছু মেলে — সে তাঁহাদের ফেলিয়া-দেওয়া সিগারেটের কুটিঙ্গ

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিলঙ্গ তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলঙ্গ বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল ও চঞ্চল করিয়া তুলিলঙ্গ

কিন্তু তিন দিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেলঙ্গ গাছে বাঁধা ডোঙাটা তর।ঘাতে মৃদু দোল খাইতেছিলঙ্গ তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়া ছিল — যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে তাহারই প্রতিক্ষায়, সে হাঁটিয়া পার হইবে নাঙ্গ এ অবস্থায় তাহারা দুইজন মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়ঙ্গ

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিলঙ্গ তারিণী বলিল, ই কি হল বল্ দেখি কেলে?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তোঙ্গ

তারিণী আবার বলিল, এমন তো কখনও দেখি নাইঙ্গ

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তোঙ্গ

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনে — ফরস লী-ল পচি দিকেও তো ডাকে নাঙ্গ

কালাচাঁদ এবার উত্তর দিল, তাই তোঙ্গ

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া তারিণী বলিল, তাই তো! 'তাই তো' বলতেই যেন আমি ওকে বলছিঙ্গ তাই তো! তাই তো! তাই তো!

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভেত মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলঙ্গ কালাচাঁদের সে দৃস্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলঙ্গ কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে লয় কেলে, পচি বইছে, না? বলিতে বলিতে সে লাফ দিয়া ডা।য় উঠিয়া শুষ্ক বালি একমুঠো ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিলঙ্গ কিন্তু বায়প্রবাহ অতি ক্ষীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল নাঙ্গ তবুও সে বলিল, হুঁ পচি থেকে ঠেলা বইছে — একটুকুনঙ্গ আয় কেলে, মদ খাব, আয়ঙ্গ দু আনা পয়সা আছে আজঙ্গ বার করে লিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলেঙ্গ

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশি হইয়া উঠিয়াছিলঙ্গ সে তারিণীর স। ধরিয়া বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদাঙ্গ বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেইঙ্গ মলাম আমরাইঙ্গ

তারিণী বলল, সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভালঙ্গ উ না থাকলে আমারঙ্গ

'হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি' হয় ভাইঙ্গ সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে —

বাধা দিয়ে কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লিঙ্গ

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িলঙ্গ

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলায় বসিয়াছিল, তারিণী প্রশ্ন করিল, কোথা যাবা যে তোমরা, বাড়ি কোথা?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দ্রপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমানঙ্গ

কালাচাঁদ প্রশ্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি?

জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কিনা

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেলঙ্গ দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিলঙ্গ গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল; জনমজুরের মধ্যে উপবাস শুরু হইলঙ্গ দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিলঙ্গ

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল কালাচাঁদ আসে নাইঙ্গ প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল নাঙ্গ তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলেঙ্গ

কেহ উত্তর দিল নাঙ্গ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাইঙ্গ পাশের বাড়িতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িও শূন্যঙ্গ শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্যঙ্গ পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেঙ্গ

হারু মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী, যাস না সব, যাস নাঙ্গ তা শুনলে না, বলে, বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করবঙ্গ

তারিণী বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; সে ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলঙ্গ

হারু আবার বলিল, দেশে বড়নোক কি আছে? সব তলা-ফাঁকঙ্গ তাদের আবার বড় বেপদঙ্গ পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে পারে নাঙ্গ এই তো কি বলে — গাঁয়ের নাম, ওই যে — পলাশডা॥, পলাশডা॥র ভদ্দরনোক একজন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেঙ্গ শুধু অভাবে মরেছেঙ্গ

তারিণী শিহরিয়া উঠিলঙ্গ

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! মাঠের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহে পড়িয়া ছিলঙ্গ কতকটা তার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছেঙ্গ তারিণী চিনিল, একটি মুচি পরিবারের বৃদ্ধ মাতা এ হতভাগিনীঙ্গ গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যু-কামনা বারবার তাহারা করিতেছিলঙ্গ বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিলঙ্গ রাত্রে ঘুমন্তবৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পালাইয়াছেঙ্গ

সে আর সেখানে দাঁড়াইল নাঙ্গ বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, খান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লেঙ্গ আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাবঙ্গ দিন খাটুনি তো মিলবেঙ্গ

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া কোন গহনাই সুখীর নাইঙ্গ তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর?

সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে বল?

তারিণী গ্রাম ছাড়িলঙ্গ

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধায় গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিলঙ্গ গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিলঙ্গ তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলঙ্গ থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখ, গামছাখানাঙ্গ গামছাখানা লইয়া হাতে ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিলঙ্গ ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছেঙ্গ সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নাই তুমি?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না ঘুম এল নাঙ্গ

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ব্যামো-স্যামো হলে কী করব বল দেখি আমি? ই মানুষের বাইরে বেরুনো কেনে বাপ, ছি-ছি-ছি!

বাসা ভেসে যাবেঙ্গ ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস? ঝাড়া পশ্চিম থেকেঙ্গ

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে — চকচক করছেঙ্গ

তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ? ওই দেখ্, কাকে কুটো তুলছে — বাসার ভামা-ফুটো সারবেঙ্গ আজ এইখানেই থাক্ সুখী, আর যাব না; দেখি মেঘের গতিকঙ্গ

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় নাইঙ্গ অপরাহ্নের দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিলঙ্গ

তারিণী বলিল, ওঠ্ সুখী, ফিরবঙ্গ

সুখী বলিল, এই অবেলায়?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছিঙ্গ লে, মাখালি তু মাথায় দেঙ্গ টিপটিপ জল ভারি খারাপঙ্গ

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমার শরীর বুঝি পাথরের?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে, ই আমার জলের শরীর, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলেঙ্গ চল্, দে, পুঁটুলি আমাকে দেঙ্গ

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিলঙ্গ উতলা বাতাসের সং। অল্প কিছুক্ষণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থাকেঙ্গ কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস প্রবল হয় সং। সং। নামে বৃষ্টিঙ্গ

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুই দিনেঙ্গ সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া লদীর ঘাট দেখে আসিঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখীঙ্গ

প্রভাবে উঠিয়াই তারিণী ঘাটে যাইবার জন্য সাজিলঙ্গ আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মত বাতাস সং। সং। ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টিঙ্গ

দ্বিপ্রহের তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার বাড়ি চললাম আমিঙ্গ

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছুঙ্গ

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটা বড় গজাল খুলে গেইছেঙ্গ সে না হ'লে — উহুঁ, অল্প বান হ'ল না হয় হ'ত, লদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে, দেখলে আয়ঙ্গ

সুখীকে না দেখাইয়া ছাড়িল নাঙ্গ পালদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপঙ্গ বিস্তৃতি যেন পারাপারহীনঙ্গ রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেঙ্গ তারিণী বলিল, ডাক শুনছিল — সোঁ-সোঁ? বান আরও বাড়বেঙ্গ তু বাড়ি যা, আমি চললামঙ্গ লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব নাঙ্গ

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জল ঝড় —

তারিণী সে কতা কানেই তুলিল নাঙ্গ দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইয়া গেলঙ্গ

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছেঙ্গ দ্রুতপদে সে আসিতেছিলঙ্গ কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না? হাঁ ডুগডুগিই বটেঙ্গ এ শব্দের অর্থ তো সে জানে আসন্ন বিপদঙ্গ নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়ঙ্গ

তারিণীর গ্রামের ও-পারে ময়ূরাক্ষী, এ-পাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট্ট শাখা নদীঙ্গ একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথঙ্গ তারিণী সড়ক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল নাঙ্গ তবে পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ পর ঠাহর করিল, যে পুলের মুখ এখন অন্তত এক শত বিঘা জমির পরেঙ্গ ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডগায় ছিল জলের সীমাঙ্গ দেখতে দেখতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেলঙ্গ সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মত গোঁ-গোঁ শব্দঙ্গ দেখিতে দেখিতে সর্বা। তাহার পোকায় ছাইয়া গেলঙ্গ লাফ দিয়া মাটির পোকা পালাইয়া যাইতে চাহিতেছেঙ্গ

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলঙ্গ

ক্ষিপ্রগতিতে মাঠের জল অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিলঙ্গ গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছেঙ্গ এক কোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছেঙ্গ পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছেঙ্গ গরু ছাগল ভেড়া কুকুর সে কি ভয়ার্ত চীৎকারঙ্গ কিন্তু

সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহসেথর ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবেঙ্গ

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তারিণীর পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়ঙ্গ হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা, শেষ হইয়া গিয়াছেঙ্গ সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সে বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল — অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিলে, এই যে, ঘরে আমিঙ্গ

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণী দেখিল, ঘরের উঠানে এক কোমর জলঙ্গ দাওয়ার উপর এক হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছেঙ্গ

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘর চাপা প'ড়ে মরবি যেঙ্গ

সুখী বলিল, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছিঙ্গ কোথা খুঁজে বেড়াবে বল দেখি?

পথে নামিয়া তারিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি করি বল দেখি সুখী?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াওঙ্গ সবার যা দশা হবে, আমাদেরও তাই হবেঙ্গ

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?

তারিণী এ আশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল নাঙ্গ

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যার জল ছটকাইয়া দুলিয়া উঠিলঙ্গ তারিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পড়ল সুখীঙ্গ চল, আর লয়, জল কোমরের ওপর উঠিল, তোর তো এক ছাতি হয়েছে তা হ'লেঙ্গ

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারীকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, ওগো খোকা প'ড়ে গেইছে বুক থেকেঙ্গ খোকা রে!

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি, সুখী, ডাকলে সাড়া দিসঙ্গ

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেলঙ্গ শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, কে? কোথা? কার ছেলে প'ড়ে গেল, সাড়া দাও ওই!

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যিঙ্গ

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই!

কিছুক্ষণ ধরিয়া কণ্ঠস্বরে সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেলঙ্গ তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখীঙ্গ

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ?

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তারিণী আসিয়া, বলিল, আমার কোমর ধর্ সুখী গতিক ভাল নয়ঙ্গ

সুখী আর প্রতিবাদ করিল নাঙ্গ তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কা'র ছেলে বটে? পেলে?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভূপতে ভল্লার ছেলেঙ্গ

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিলঙ্গ জল ক্রমশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছেঙ্গ তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ সুখীঙ্গ কিন্তু এ কোন্ দিকে এলাম সুখী, ই — ই —

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেলঙ্গ পরক্ষণেই কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, লদীতেই বা পড়লাম সুখীঙ্গ পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধ'রে ভেসে থাকঙ্গ

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছেঙ্গ গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে — হু-হু শব্দে, তাঁহারই সঙ্গে। মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়মুড় শব্দঙ্গ চোখে মুখে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মতঙ্গ কুটার মত তাহারা চলিয়াছে — কতক্ষণ, তাহার অনুমান হয় না, মনে হয়, কতদিন কত মাস তাহার হিসাব নাই — নিকাশ নাইঙ্গ শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতছিলঙ্গ মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তর। শ্বাসরোধ করিয়া দেয়ঙ্গ কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিয়াছেঙ্গ তারিণী ডাকিল, সুখী — সুখী?

উন্মত্তার মত সুখী উত্তর দিল, অ্যাঁ?

ভয় কি তোর, আমি —

পর মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল, জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছেঙ্গ ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারাঙ্গ সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিলঙ্গ কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছেঙ্গ কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবেঙ্গ সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলঙ্গ কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মত জড়ায়িা ধরিতেছে? সে ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছেঙ্গ সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছেঙ্গ বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেলঙ্গ তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিলঙ্গ কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিলঙ্গ বাতাস — বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিলঙ্গ পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়ঙ্গ দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিলঙ্গ সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশঙ্গ হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছেঙ্গ যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াচিল, সেটা খসিয়া গেলঙ্গ সঙ্গে। সঙ্গে। জলের উপরে ভাসিয়া উঠিলঙ্গ আঃ, আঃ — বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটিঙ্গ

৪০.৫ সারাংশ

'তারিণী মাঝি' গল্পের গল্পাংশ সামান্যঙ্গ গল্পের নায়ক তারিণী অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহীঙ্গ তার স্ত্রী সুখীঙ্গ তারা নিঃসন্তানঙ্গ তারিণী ময়ূরাক্ষী নদী সংলগ্ন গুনটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করেঙ্গ তার এই কাজে একমাত্র সাী কালাচাঁদঙ্গ ডোঙায় লোকপারাপার করা শুধু তার জীবিকা নয়, এটি তার যেন নেশাঙ্গ কিন্তু বর্ষার দিনের উত্তাল, ভয়াল ময়ূরাক্ষীর বুকে বেশী যাত্রী এক সঙ্গে। নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে অনেকঙ্গ ময়ূরাক্ষী ভয়াল ভয়ঙ্কর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরেই তারিণীর মাঝি-জীবনের ভাগ্য নির্ভর করেঙ্গ

নদী হিসেবে ময়ূরাক্ষীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছেঙ্গ রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য নদীর মত সে আট মাস থাকে মরুভূমির মত শুক্‌নোঙ্গ কিন্তু বর্ষা এলেই সে হয় 'রাক্ষসীর মত ভয়ংকরীঙ্গ' তখন যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে অসম্ভব প্লাবনে দুকূল অতিক্রম করে চতুস্পার্শ্বের গ্রাম, বাড়ী, ধনসম্পদ, লোকজন ভাসিয়ে দিতে পারেঙ্গ জীবন হানি ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষেরঙ্গ গল্পের উপসংহারে দেখব এই ময়ূরাক্ষী আর তারিণী বুঝিবা একই জীবন বৈশিষ্ট্যে আত্মীয়ঙ্গ ময়ূরাক্ষী নদী জীবিকার সূত্রে তারিণীর জীবন ধারণে সাহায্য করেঙ্গ তারিণীর আছে সুখীর মত স্ত্রী — নামেও স্বভাবে যে যথার্থই সুখজঙ্গ স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় একটুকুও খাদ নেইঙ্গ সমস্ত রকম ছোট-বড়, সুখ-দুঃখ বিপদের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্তভাবে আপন হয়ে থাকেঙ্গ ময়ূরাক্ষীর বুকে কারও বিপদ ঘটলে, জলে ডুবে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটলে, তারিণী নির্দ্বিধায় তাঁকে বাঁচায়ঙ্গ কেউ খুশী হয়ে যা দেন, তাতেই সে খুশীঙ্গ টাকা, পয়সা, অলংকার, খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড় উপহার পেলে সে সব দিয়ে খুশী করে স্ত্রী সুখীকেঙ্গ এভাবে সে নিজের সুখের জীবন ভরিয়ে রাখেঙ্গ

কিন্তু ময়ূরাক্ষীর জীবন সব সময় সমান তালে চলে নাঙ্গ এক সময় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে তারিণীর পেশা বন্ধ হয়ে যায়ঙ্গ তারিণীর কষ্টের শেষ থাকে নাঙ্গ খাদ্যের অভাবের সে। আশপাশের গ্রাম মড়ক লাগেঙ্গ গ্রাম ছেড়ে সব পালাতে থাকেঙ্গ শেষে তারিণী আর সুখীও গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ঙ্গ ময়ূরাক্ষীর মাঝি, তারিণীঙ্গ সে হাওয়ার গতিক বোঝেঙ্গ বুঝতে পারে বর্ষা আসন্নঙ্গ সুখীকে নিয়ে যে ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখেঙ্গ সত্যিই যখন আবার বর্ষার মেঘ এলো ও তা থেকে ঘনবর্ষণ হোল, তারা বাড়ী ফেরাই স্থির করল এবং পরিশেষে ফিরে আসেঙ্গ ক্রমশ আকাশের অবিরাম বর্ষণ আর নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে প্লাবিত করেঙ্গ বাড়ী ঘরদোর গরু বাছুর মানুষ বন্যায় বিধ্বস্ত ও ডুবে যায়ঙ্গ তারিণী আর সুখীও তাদের ভাঙা ঘর-বাড়ি ছেড়ে নদীর বুকে প্রতিকূল অবস্থায় ভাসতে থাকেঙ্গ শেষে উভয়েই অবধারিত জীবন-সংশয়ের কালে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ঙ্গ সুখী তাকে আঁকড়ে থাকেঙ্গ তারিণী এই সংকটে, বাঁচবার একান্ত আকায়ায়, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে জড়িয়ে থাকা, তাঁর একান্ত ভালবাসার, একমাত্র আপনজন — স্ত্রী সুখীর বজ্রমুষ্ঠি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁর গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে, নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়ঙ্গ আলো আর মাটির আশ্রয়ে তারিণী বুক ভরে শ্বাস নেয়ঙ্গ গল্প এখানেই শেষ হয়েছেঙ্গ

৪০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পের একটি কাহিনী আছে, কিন্তু তার গল্পাংশ কমঙ্গ গল্পটি গড়ে উঠেছে দুটি চরিত্রকে আশ্রয় করে — তারিণী আর সুখীঙ্গ এর সে। যুক্ত হয়েছে একটি চরিত্র ময়ূরাক্ষী নদীঙ্গ ময়ূরাক্ষী লেখকের বর্ণনার গুণে ও তাঁর প্রকৃতি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিল্পীর প্রয়াসে নদীটিও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছেঙ্গ গল্পের কাহিনীবৃত্ত ছোটঙ্গ উপস্থাপনা সংযতঙ্গ গল্প পূর্বাপর শিল্পের শাসনে নির্মেদ ও সংহতঙ্গ গল্পের শুরু তারিণীর কথায় — সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের ঘটনা দিয়েঙ্গ শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে, তারিণীর নিতান্ত আত্মরক্ষার চিত্র রচনায়ঙ্গ কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গল্পাংশে রক্তমাংষ জুগিয়েছেঙ্গ

৮২৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে যে, মানুষের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত

হয়ে থাকা কোনো একটা আদিম প্রবৃত্তি সহসাই কালসর্পের মতো ফণা তুলে কাহিনীর ট্রাজিক পরিণামকে সূচিত করেঙ্গ 'তারিণী মাজি' এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছেঙ্গ অনেক সময়ই অবশ্য তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রধান কোনো চরিত্রের মধ্যে ঐ ধরনের জৈবিক বৃত্তির সন্ধান পূর্বাপরই মেলে; সেই সব ক্ষেত্রে নিয়তির চূড়ান্ত আঘাতটি কাহিনীর পরিশেষে বজ্রের মতো আছড়ে পড়লেও, তার প্রস্তুতিটা অনেক আগে থেকেই অনুভব করা যায়, হয়ত বা নিজেরও অগোচর-অবচেতনের মধ্যেঙ্গ এই ধরনের কাহিনী হল 'অগ্রদানী', কিংবা 'আখড়াইয়ের দীঘি', অথবা 'বেদেনী'ঙ্গ আর 'তারিণী মাঝি'-র সঙ্গে পংক্তিভুক্ত হতে পারে 'দেবতার ব্যাধি'-র মতো গল্পঙ্গ

'তারিণী মাঝি' গল্পের বিষয়-উপকরণের সঙ্গে বীরভূমের নিসর্গপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিতঙ্গ এটা অবশ্য তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই দেখিঙ্গ কিন্তু 'তারিণী মাঝি' গল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একটু ভিন্নতর মাত্রিকঙ্গ গণুঘাটের খেয়ানৌকোর মাঝি তারিণী এবং তার স্ত্রী সুখীর মতোই প্রবল বন্যায় হিংস্র হয়ে ওঠা ময়ূরাক্ষী নদীও এই কাহিনীর অন্যতম একটি প্রধান চরিত্রঙ্গ বস্তুতপক্ষে, তারিণী, সুখী এবং ময়ূরাক্ষী — এই তিনটি চরিত্রই বলা যেতে পারে সমান গুরুত্বপূণলঙ্গ মানুষের মনের অবচেতনে তলিয়ে থাকা যে-সব প্রবণতা আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে পারিপার্শ্বিকের অপ্রতিরোধ্য প্ররোচনায়, তাদেরই একটি — আত্মরক্ষার সহজাত বৃত্তি — এই কাহিনীর ট্র্যাজেডির মূল উপলক্ষঙ্গ ঐ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের প্ররোচনা এখানে এসেছে ময়ূরাক্ষীর বিধ্বংসী বানের মূর্তিতে, কাহিনীর ভিলেন হয়েঙ্গ

গণুঘাটের খেয়ামাঝি তারিণী; তার সহকারী হল কালাচাঁদঙ্গ ময়ূরাক্ষীর বুকে এপার-ওপার করে তারা নৌকা বোঝাই যাত্রী নিয়েঙ্গ তাদের দেওয়া 'পারের কড়িতে'-ই তারিণীর গ্রাসাচ্ছাদনঙ্গ এর ওপরে কখনো - কখনো জোটে ডুবন্ত মানুসজন, গরুমহিষকে বাঁচানোর বকশিস্ ঃ টাকা, কাপড়, কখনো টুকিটাকি গয়নাগাঁটিওঙ্গ পুত্রবধূকে জলে ডোবা থেকে রক্ষা করার পুরস্কার স্বরূপ কোনো বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ হয়ত দেন টাকা; বরাত থাকে পরবর্তী দশহরার সময় ধুতি-চাদরেরঙ্গ সলজ্জভাবে তারিণী চাদরের বদলে হয়ত চেয়ে নেয় বক্ষয়ের জন্য নতুন শাড়িঙ্গ তারিণীর হাতে হয়ত জলে-পড়ে যাওয়া কিশোরী বধূটি তুলে দেয় নিজের নাকেরই সোনার নথটুকুইঙ্গ একখানা 'ফাঁদি লত্''-ও ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়েছিল তারিণী তার সুখীর জন্যেঙ্গ

এইসব ছোটখাট ঘটনাগুলিই তারিণী-সুখীর দাম্পত্য সুখের নির্দেশিকাঙ্গ সন্তানহীনতার বেদনা আছে তাদের, কিন্তু সেটা গ্রাস করে ফেলেনি তাদেরকেঙ্গ মদ খায়, কালাচাঁদের সঙ্গে। ঝগড়া করে, আবার সুখীর শাসন মেনে খুশিও থাকে তারিণীঙ্গ এইভাবেই দিন কাটে তাদেরঙ্গ

রাঢ়বাংলার প্রবল খরায় কোনও একবার দেশজুড়ে হাহাকার পড়েঙ্গ ময়ূরাক্ষীর বুকে চড়া পড়ে মাইলের পর মাইলঙ্গ খেতখামারে ফসল নেইঙ্গ গরিবগুর্বোর ঘরে খাবার নেইঙ্গ গ্রামের পর গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ছে — স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে মানুষ চলছে শহর অভিমুখে, কাজের সন্ধানেঙ্গ একদিন নিরুপায় হয়ে তারিণীও বেরিয়ে পড়ে সুখীর হাত ধরে ঃ ''দিন-খাটুনি তো মিলবেঙ্গ''

কিন্তু ক-দিনের মধ্যেই নদীতে প্রবল বান আসার সঙ্কেত পায় ময়ূরাক্ষীর 'সন্তান' অভিজ্ঞ খেয়ার মাঝি তারিণীঙ্গ তিনদিনের পেরিয়ে-আসা পর নবোদ্যমে ফিরে আসে সে বউকে নিয়েঙ্গ আসন্ন বর্ষায় টইটম্বুর হয়ে নদী আবার তাকে ফিরিয়ে দেবে জীবিকা, মনের নিশ্চিন্ততা, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল একসময়ে বিস্তীর্ণ লালমাটির দেশঙ্গ

অবশেষে বানও এক সময়ে এল — তার ''বিস্তৃতি যেন পারাপারহীনঙ্গ'' নদীর বুকে ডুগডুগি বেজে উঠে আসন্ন বিপদের ইশারা দিলে গেলঙ্গ গ্রামের মধ্যেও বান ঢোকে — ভাসতে থাকে বাড়ির চালা, গরুর-বাছুর, মানুষঙ্গ বন্যার প্রবল শব্দ, ঝড়বাদলের প্রবল ঝাপ্‌টা আর মানুষ ও পশুর ভয়ার্ত চেঁচামেচিতে যেন বিশ্বজগৎ ভরে যায়ঙ্গ

মায়ের বুক থেকে খসে-পড়া ভূপতি ভল্লার সন্তানকে এর মধ্যেই উদ্ধার করে তারিণীঙ্গ কিন্তু জল ক্রমশই বাড়তে থাকে; সুখীকে পিঠে নিয়ে সাঁতার দিতে শুরু করে সে — জীবনের সহজাত আত্মরক্ষার আকুতিতেঙ্গ কিন্তু অথই জলের সে। পাল্লা দেবার সামর্থ্য কমে আসে বহু বচরের ময়ূরাক্ষী — অভিজ্ঞ তারিণী মাঝিরওঙ্গ তারিণী 'অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছেঙ্গ ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারাঙ্গ সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিলঙ্গ কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছেঙ্গ কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবেঙ্গ ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছেঙ্গ সুখী — তারিণীর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল যে সুখী তার নিরুপায়, অসহায় হাতদুটোর নাগপাশের মতো বলে মনে হচ্ছে জীবনের বৃহত্তম বন্যার মধ্যে বিপন্ন হওয়া তারিণী মাঝিরঙ্গ একটা সময়ে, প্রাণাধিকা সুখীর ঐ ভয়ার্ত বন্ধনই তার কাছে প্রতীত হল অনিবার্য মৃত্যুফাঁস রূপে! মুহূর্তের মধ্যে প্রেমকে, হৃদয়াবেগকে নিশ্চিহ্ন করে ''দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল!'' .... সুখীর মৃতদেহ তলিয়ে গেল একটু পরেই — জলের উপর ভেসে উঠে বুক ভরে বাসাত টেনে তারিণী পেতে চাইল — ''আলো ও মাটিঙ্গ''

এই হল এ-কাহিনীর পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান — যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বিক্ষিপ্ত নয়ঙ্গ দুটি মানুষের নিবিড় আত্মিক বন্ধনও যে জীবনার্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই নির্মম নিষ্ঠুর সত্যটিকে এইভাবেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন তারাশঙ্করঙ্গ

৮৩৮

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কয়েকটি মৌল ঈপ্সার কথা হামেশাই বলে থাকেনঙ্গ ক্ষুধা, যৌনবাসনা এবং আত্মরক্ষার সহজাত তাড়না — এই তিনটিই হল সেই সব মৌল ঈপ্‌সার (Basic urge) মধ্যে প্রবলঙ্গ এদের মধ্যে আবার প্রবলতম কোন্‌টি তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের ঐক্যমত ঘটতে দেখা যায় না বিশেষঙ্গ তারাশঙ্করের এই কাহিনী হয়ত বা সেই বিতর্কের একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ দিতে পারেঙ্গ

অধ্যাপক ফ্রয়েড এবং তাঁর চিন্তানুসায়ী মনোবিদ্‌রা বলে থাকেন যৌনবাসনাই হল প্রবলতম অভীক্ষা মানুষের জীবনেঙ্গ পরিশীলিত হয়ে সেটাই প্রেমে রূপান্তর লাভ করে এবং জীবনের সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয় তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রণোদনায়ঙ্গ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে প্রেম যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেও অলক্ষ্যসঞ্চিত যৌন-অভীপ্সাই নিয়ন্ত্রণ করে সব কিছু — এমনই সিদ্ধান্ত ফ্রয়েডপন্থীদেরঙ্গ

কিন্তু ক্ষুধা এবং আত্মরক্ষার তাড়নাই (বহুক্ষেত্রেই এই দুই ঈপ্‌সা আবার পরস্পরের সে। ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে) সম্ভবত প্রবলতর — কামনা (বা প্রেম) তাদের তুলনায় শেষ বিচারে পিছিয়ে পড়েঙ্গ যে সুখী ছিল তার ধ্যানজ্ঞান, যার আনন্দবিধানের জন্য সে মানুষের পরিহাস-বিদ্রূপও গায়ে মাখেনি, রাত-

দুপুরে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেও সে যে সুখীর গায়ে হাত না তুলে (যা তার সমতুল্য আর পাঁচটা কঠিন - শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে ছিল একান্তই স্বাভাবিক) তাকে নিয়ে গান গেয়ে, গয়না পরিয়ে আহ্লাদ করেছে — নিজের প্রাণটুককে রক্ষা করার সহজাত প্রবণতার পথে যখন নদীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সেই সুখীই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন নিজেকে বাঁচানোর জৈবিক প্রণোদনায় তারিণী তাকেও 'দুই হাতে সুখীর গলা পেষণ করিয়া' হত্যা করে নিজের নিরাপত্তা সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেঙ্গ অন্ধ আত্মরক্ষার তাড়নাই তার কাছে তখন সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে প্রেম-নারী-সংসার-গৃহ-দাম্পত্য — সমস্ত কিছু সেই ভয়াল মৃত্যুর বিভীষিকার সামনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশিষ্ট থেকেছে শুধুমাত্র ব্যাকুল জীবনাতিটুকুইঙ্গ সুখীর সে। সে। তার অন্যান্য সমস্ত মানবিক বৃত্তি এবং আকাঙ্খাগুলিও তলিয়ে গেছে বানভাসি ময়ূরাক্ষীর বুকে মৃত্যুফাঁদস্বরূপ জলের অতলস্পর্শী ঘূর্ণির গহ্বরেঙ্গ

অথচ, এই মানুষটির স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল বিপন্ন মানুষকে (এমন কি অবলা পশুকেও) জল থেকে তুলে আনার — প্রায়শই সেটা বিনা লোভেইঙ্গ ঘোষবাড়ির কিশোরী বউটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচানোর পরে পুরস্কার হিসেবে প্রথমে সে চেয়েছিল মাত্র আট আনা পয়সা — এক বোতল দেশি মদের দাম — তারপরে সাবি প্রমুখের তাগিদে তার হুঁস হয়েছে দামী কিছু চাওয়া যেতে পারে বলেঙ্গ পাঁচ টাকা বকশিস পেয়ে, তার থেকে দু-টাকার সে অকাতরে দান করে দিতে পারে 'কেলে'-কে — সে ঐ উদ্ধারের কাজে আদৌ কোনো সহায়তা না করলেও! সুখীকে মেরে ফেলবার সামান্য কিছু আগেই সে তো ঐ বিপর্যয়ী প্লাবনকে অগ্রাহ্য করেই জলে পড়ে যাওয়া শিশুকে নিজের প্রাণের মায়া না রেখে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে তার মায়ের কোলেঙ্গ সেখানে তো পুরস্কার-পার্বণীর কোনো দূরতম হাতছানিও ছিল নাঙ্গ

৮৪৮

প্রকৃতির দুই রূপ ঃ হনাত, সমাতি এবং প্রলয়ঙ্করীঙ্গ ময়ূরাক্ষী যখন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে, তখন মানুষের মধ্যেও সেই ধীরতোয়া শান্ত ভাবটিই দেখিয়েছেন তারাশঙ্করঙ্গ তখন তারিণীও খেয়াযাত্রীদের নিয়ে পরিহাস করে, মায় কালাচাঁদওঙ্গ যাত্রীরাও করেঙ্গ সেই র।-রসিকতা, হাসি-গল্প ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যায়, যখন প্রবল খরায় সমস্ত এলাকাটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েঙ্গ প্রকৃতির নির্মম নিষ্ঠুরতা মানুষের পেটের ভাত, মাথার ছাদ এবং মুখের হাসি সবই কেড়ে নেয় তখনঙ্গ এরপরে প্রকৃতি যখন ভয়ালতর রূপ ধরে বিধ্বংসী বন্যায়, তখনও মানুষের মানবীয় বৃত্তিগুলি প্রারম্ভিক ভাবে সচেতন থাকে (ভূপতে ভল্লার ছেলেকে তারিণীর নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঁচানো যার প্রমাণ), কিন্তু তারপরেই সংকট যত বাড়ে মানুষ আর সব ভুলে যায় — তর সমস্ত অস্তিত্ববোধ টিকে থাকে আদিম এবং হিংস্র মানসিক প্রবৃত্তির কাঠামোর ওপরে ভিত্তি করে, আত্মরক্ষার জন্য সে তখন পশুর মতো নৃশংস (সুখীর হত্যা যার নির্দশন)ঙ্গ

প্রকৃতি এবং মানুষের এই বিচিত্র পারস্পরিকতাকেও এই কাহিনীর মাধ্যমে সুনিপুণভাবে প্রতিবেদিত করেছেন তারাশঙ্করঙ্গ বীরভূমের মানুষ এবং প্রকৃতি — দুইই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতঙ্গ প্রাকৃতিক বিপর্যয় — খরা, বন্যা ইত্যাদিকে যেমন তিনি আপন অভিজ্ঞতার তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন, ঠিক একইভাবে ময়ূরাক্ষী পারের গ্রামীণ মানুষগুলিকেও বাস্তব করে তুলেছেনঙ্গ

'তারিণী মাঝি' গল্পের এই বাস্তবধর্মিতারও একটি বিশেষ মাত্রা আছেঙ্গ জীবনের নির্মম রূপটিকে এই কাহিনীতে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাকে রিয়ালিজম বলার চেয়ে ন্যাচারালিজ্‌ম বলাই হয়ত বেশি

বাঞ্ছনীয়ঙ্গ রূঢ় বাস্তবকে কোনো পেলব আস্তরণে না-মুড়ে, মানুষের মনের আদিম জান্তবতাকে যেভাবে এই গল্পে উন্মোচিত করা হয়েছে তাকে সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় ন্যাচারালিশ্টিকই বলতে হয়ঙ্গ তবে এভাবে সীমানাবদ্ধ করে একটি সৃষ্টির কুলপ্রতীক নির্দেশ অবশ্য সাম্প্রতিককালে বিশেষ আর করা হয় নাঙ্গ আসলে কাহিনীর এই আচম্বিত পরিণামের ফলশ্রুতিতে 'তারিণী মাঝি' একটি বন্দেজী ছোটগল্প বলে যেমন পরিগণ্য হয়, তেমনই আবার এই পরিণামেরই প্রেক্ষিতে এটিকে গ্রিক ট্রাজেডি-সুলভ 'হ্যামার্তিয়া' জনিত নিয়তি নির্দেশের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিও হয়ত বা বলা যায়ঙ্গ

৮৫৮

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই গল্পটি সম্বন্ধেঙ্গ তিনি লিখছেন ঃ ''স্বয়ং লেখক বহুকাল পরে গল্পটিকে আবার স্মরণ করেছিলেনঙ্গ প্রবন্ধে স্মরণ নয়, কাহিনীতে স্মরণ — একরকম রি-মেকঙ্গ বার্ধক্যে 'বিচারক' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি নিজের পরিণত যৌবনকালকে তার ভাবনা-চিন্তা-বিশ্বাসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেনঙ্গ অর্থাৎ এই তারিণী মাঝি লেখককে ভিতরে ভিতরে ভুগিয়েছিল অনেক বছরঙ্গ অথবা তারিণী শুধুই উপলক্ষঙ্গ ওঁর অনেক গল্পই এই যন্ত্রণার উৎস হয়ে উঠেছিলঙ্গ নিজের সৃষ্টি যখন তাড়া করে সে বড় কঠিন পলায়ন — নিজের কাছ থেকে বলেই নাঙ্গ'' (তারাশঙ্কর ঃ অনুসন্ধান '৯৮ / ১৯৯৮; পৃঃ ১২৮)

ক্ষেত্রবাবু যে মনোকূটের ইতি করেছেন, তার বিস্তার গভীরপ্রসারীঙ্গ 'বিচারক' উপন্যাসের নায়ক তাঁর প্রথমা স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব — অন্ততপক্ষে নিজের মনের গভীরে অস্বীকার করতে পারেন নিঙ্গ পরবর্তী সমস্তটা জীবনের প্রতিটি চেতন-মুহূর্তে তাঁকে সেই দায়িত্বচ্যুতিজনিত অপরাধবোধ যেন এক অনির্দেশ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়িয়েছেঙ্গ তারিণী একান্তভাবেই জৈবিক এক প্রবৃত্তির অমোঘতার বশে প্রিয়তমা পত্নীকে হত্যা করে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে — আসন্ন মৃত্যুঘূর্ণির ভয়াল নাগপাশবন্ধন থেকে রেহাই পেয়ে সে খুঁজেছে বাতাস, আলো, মাটিঙ্গ গল্পে তো ঐখানেই শেষ; পরবর্তী সময়ে তারিণী তার ঐ আচম্বিত অপরাধের গ্লানিতে জর্জর হয়েছে কি-না, গল্পকার তা আর জানাননি; জানালে গল্প আর 'ছোটগল্প' থাকত না, হয়ে উঠত উপন্যাসঙ্গ কিন্তু ঔপন্যাসিক ঠিক সেইটিই করেছেনঙ্গ ফলত, সে জিজ্ঞাসা অনিরসিত থেকে গেছে এই গল্পে, তাকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যান করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ঐ উপন্যাসেঙ্গ গল্পেতে যা ছিল আংশিক, উপন্যাসে সেটাই হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণঙ্গ একটু পার্থকয অবশ্য আছে ও-দুয়ের মধ্যে — প্রেমের প্রতিমা হওয়া সত্ত্বেও জীবনসঙ্গিনী সুখীকে তারিণী হত্যা করেছে এক লহমার মধ্যে, নিজেকে বাঁচাবার তাগিদেঙ্গ আর 'বিচারক'-এর নায়ক তাঁর প্রেমহীন জীবনসঙ্গিনীকে উদ্ধার করেন নি আগুণের মৃত্যুফাঁদ থেকে — হয়ত এভাবেই তিনি রেহাই পেতে চেয়েছেন জীবনের নিষ্করুণ অপ্রেম থেকে, অবচেতন বিতৃষ্ণার প্ররোচনায়ঙ্গ তারিণীর কাছে যা ছিল চেতনালুপ্ত সহজাত এক জৈবিক অভীক্ষা, 'বিচারক'-এর হাকিম সাহেবের কাছে সেটাই ছিল অবচেতন (না-কি, চেতন?) একটি গূঢ় কুটিল মনোকূটঙ্গ তাই গল্প এবং উপন্যাস — দুয়ের মধ্যে সমধর্মিতা যতটাই থাকুক, বৈষম্যও কিছু কম নয়ঙ্গ

আসলে তারিণীর সত্তার অন্তর্গত বিচিত্র বৈপরীত্যের টুকরো-টুকরো ইতি দিয়ে তার পরিপূর্ণ রূপটিকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন গল্পকারঙ্গ সে পত্নীপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, অকুতোভয়, পরিশ্রমী, এবং নেশাখোর, অহঙ্কারী, কটুভাষী; আবার পরিহাসপ্রিয়, বিনয়ী উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সঙ্গে দায়িত্বশীল,

সরল, সৎ ও নির্লোভঙ্গ এত ধরনের বৈপরীত্য-সাদৃশোর সমাহারেও তার চরিত্রটি কিন্তু দুজ্ঞেয় হয়ে ওঠেনিঙ্গ তাই কাহিনীর শেষ পরিণামে যখন তার প্রেম ও দায়িত্ববোধকে সে আক্ষরিক অর্থেই গলা টিপে মেরে আত্মরক্ষার আদিমতম প্রবৃত্তিকে যখন উদ্‌ঘাটিত করল আজীবনের সুপ্তি-আচ্ছন্নতাকে এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে — তখন সেই আচম্বিত পরিণতি পাঠকের মনকেও বিমূঢ় করে তোলেঙ্গ এরই মধ্যে গল্পটির শিল্প-পরিণাম আত্মপ্রকাশঙ্গ করেছেঙ্গ তারিণীর অবচেতনের ঐ আদিম হিংস্রতাকে উচ্চকিত করেছে বন্যায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা ময়ূরাক্ষী নদীওঙ্গ আর সমস্ত বিবাহিত জীবনভোর যে তাকে লতার মতো অবলম্বন করে বেঁচে থেকেছে নির্ভয় নিশ্চিন্ততায়, সেই সুখী — তার বউ — অতলজলের মধ্যে হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল ঐ চিরাভ্যস্ত নির্ভরতারই পরিণামেঙ্গ কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে তাই 'তারিণী' এবং 'সুখী' নামদুটি যেন নির্মম পরিহাসের প্রবল নির্ঘোষে ধ্বনিত হয়ে গল্পের ট্রাজিক পরিণতির মধ্যে সৃষ্টি করল একটি অকল্পনীয় বৈপরীত্যের মাত্রাঙ্গ

৪০.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) যে-সুখী, তারিণীর কাছে পৃথিবীতে একান্ততম প্রিয়জন ছিল, নিজের বাঁচবার তাগিদে তাকেই সে হত্যা করে বসল — এই কাহিনী পরিণাম কতখানি স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য বলে মনে হয়?

২) ''তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মানুষের মনোগহনের আলো-আঁধারিতে সন্ধিৎসু অভিযাত্রিকঙ্গ '' — 'তারিণী মাঝি' গল্পটির বিশ্লেষণ করে এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কতটা, বিচার করঙ্গ

৩) রাঢ়-বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সে। তারাশঙ্করের যে গভীর পরিচয় ছিল, 'তারিণী মাঝি' গল্পে তা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখাওঙ্গ

৪) 'বিচারক' উপন্যাস এবং 'তারিণী মাঝি' গল্প — দুয়ের কাহিনী-কাঠামো মোটামুটি একই ছাঁচের হলেও, ভাবপরিণামে দুটি পৃথক হয়েছে কেন এবং কীভাবে, বলঙ্গ

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ময়ূরাক্ষীতে আসন্ন বন্যার সংকেত কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল?

২) ময়ূরাক্ষীর বন্যার ফলে পারিপার্শ্বিক এলাকার চেহারা কেমন হয়?

৩) তারিণী-সুখীর দাম্পত্যজীবন কীভাবে কাটত?

৪) ''ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব'' কীভাবে হয় না?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) ঘোষবাড়ির বধূটি জলে পড়ে গিয়েছিল কবে?

২) 'তারিণী মাঝি' গল্পের ঘটনাকাল কোন্ বছরের?

৩) বৃদ্ধা যাত্রিণীটি সাবিত্রীকে কীভাবে হাসতে বারণ করেছিলেন?

৪) যে বানের জলে ডুবে সুখীর মৃতুয হয়, তেমন বানের নাম কী?

৫) কত বছর আগে শেষবারের মতো সেই বান এসেছিল ময়ূরাক্ষীতে?

৬) তারিণী ''ফাঁদি লত'' বখশিস পাবার পর সাবি তাকে কী শুধিয়েছিল?

৭) তারিণীর খেয়া নৌকা কোথা থেকে কোথায়-কোথায় পাড়ি দিত?

৮) মদন গোপ তারিণীকে কেন বখশিস দিয়েছিলেন?

৯) কেষ্ট দাসের বাড়ি কোথায় ছিল?

১০) সুখীর কানের ফুল কীভাবে হয়েছিল?

১১) বর্ধমানে যারা মজুর খাটতে যাচ্ছিল, তারা কোন্ গাঁয়ের লোক?

১২) কার ছেলেকে তারিণী বাঁচিয়েছিলেন বন্যার জল থেকে?

৪০.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ এবং প্রাসাঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশের শেষাংশ ও তৃতীয় অংশের প্রথমার্ধ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুনঙ্গ

২) মূলপাঠ এবং আলোচনা পঞ্চম অংশের সাহায্যে উত্তর দিনঙ্গ

৩) মূলপাঠ এবং আলোচনা চতুর্থ অংশের সহায়তায় উত্তর করুণ

৪) আলোচনার শেষাংশ অবলম্বনে উত্তর দিনঙ্গ

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পের শেষাংশ যেখানে খেয়ামাঝি তারিণী লক্ষ্য করেছে পশ্চিমা বাতাস বওয়া, কাকের কুটো সংগ্রহ, টিপ্‌টিপ জল প্রভৃতিঙ্গ এ থেকে সংকেত পাওয়া গিয়েছিলঙ্গ — এর সাহায্যে উত্তর করুনঙ্গ

২) গল্পের শেষাংশে বন্যার জল প্রবল বেগে প্রবেশের যে বর্ণনা আছে তার সাহায্যে উত্তর তৈরী করুনঙ্গ

৩) মূলপাঠ ও প্রাসাঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে উত্তর দিনঙ্গ

৪) মূলপাঠ-এ গল্পের প্রথমাংশে তারিণী-সুখীর সংলাপে এ পরিচয় আছেঙ্গ এই অংশের সাহায্যে উত্তর প্রস্তুত করুনঙ্গ

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠের সাহায্যে একটি পূর্ণা। বাক্য রচনা করে উত্তর দিনঙ্গ

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় — *শ্রেষ্ঠ গল্প (সম্পাঃ জগদীশ ভট্টাচার্য)*

২) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রথম সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*

৩) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত — *তারাশংকর অনুসন্ধান '৯৮*

৫) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রস। ও প্রকরণ*

৬) ড. সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ শততম বর্ষাপন*

৭) ড. পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ আলোকিত দিগ্বলয়*

৮) ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় — *এক আকাশ দুই নক্ষত্র*

৯) ড. নিতাই বসু — *তারাশংকরের শিল্পীমানস*

১০)

একক ৪১ ❑ সুবোধ ঘোষ ঃ সুন্দরম্

গঠন

৪১.১ উদ্দেশ্য

৪১.২ প্রস্তাবনা

৪১.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৪১.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

৪১.৫ সারাংশ

৪১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৪১.৭ অনুশীলনী

৪১.৮ নির্ধারিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪১.৯ উত্তর সংকেত

৪১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কথা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আভির্ভাব চল্লিশের দশকেঙ্গ দেশের আকাশ-বাতাসে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোছায়াঙ্গ — রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের উঠানেও এসে সে প্রবল আঘাতে আঘাতে সমস্ত কিছুকে ভাঙচুর করছেঙ্গ বাংলা সাহিত্যের এর প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল নাঙ্গ সুবোধ ঘোসের রচনাও এর ব্যতিক্রম ছিল নাঙ্গ এতদিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের পাতার গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করলেও নিজে কোন গল্প লেখেন নিঙ্গ তাঁর গল্প লেখার সূচনা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 'অনামী সংঘের' সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের প্রেরণায় 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' দুই স্মরণীয় রচনায়ঙ্গ বন্ধুদের দ্বারা তো বটেই 'আনন্দবাজার বার্ষিকী ও 'অগ্রণী' প্রত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দ্বারা বিপুল অভিনন্দিত হয়েছেঙ্গ ছোটগল্প গ্রন্থ 'ফসিল' (১৯৪০)-এর পরে সংকলিত হয়ঙ্গ এই 'ফসিলে'রই অন্যতম রচনা — 'সুন্দরম্'-এ পূর্বেই রচিতঙ্গ

'সুন্দরম্' গল্পটি পাঠ করে আপনি সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে। তাঁর মানবচরিত্র অধ্যয়নের অসামান্য কৃতির পরিচয় পাবেনঙ্গ সেগুলি হোল —

১) গল্পটিতে আপনি লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেনঙ্গ

২) বুঝতে পারবেন চরিত্রপ্রধান এই গল্পটি লেখক মনোবৈজ্ঞানিকের গভীর দৃষ্টি নিয়ে লিখেছেনঙ্গ

৩) গল্পের নাম 'সুন্দরম'ঙ্গ লেখক সম্ভবত সৌন্দর্যতত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা দেবার জন্যই এ নামকরণ করেছেনঙ্গ

৪) পুত্রের বিবাহের যোগ্য পাত্রী সন্ধানকালে নারীর প্রতি যে নির্মম অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে, তার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র এ গল্পে তুলে ধরা হয়েছেঙ্গ

৫) মধ্যবর্গীয় কৈলাস ডাক্তারের পরিবার এবং অবরবর্গীয় তুলসী-যদু-নিমাই শ্রেণী বিভাজিত সমাজে এদের স্বতন্ত্র অবস্থানঙ্গ আর্থ-সামাজিক ভিত্তিও স্বতন্ত্রঙ্গ শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভূ যদুর গল্পের শেষ বাক্যটি যে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেনঙ্গ

৬) সুকুমার চরিত্রের অস্বাভাবিক আচরণ — আশৈশব নিরামিশ ভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম অভ্যাস অনেকটা বাতিকে পরিণত হয়েছিলঙ্গ এ হেন স্খলন-পতন অপ্রত্যাশিত হলেও অনেকটা নিয়মিত মতই অনিবার্য ছিলঙ্গ গল্পের শেষ পরিণতি, এক দিক থেকে ট্র্যাজিক হলেও কতটা বাস্তব তা বুঝতে পারবেনঙ্গ

৪১.২ প্রস্তাবনা

মহৎ প্রতিভার আশ্রয়ে পুষ্ট তরুণ প্রজন্ম নতুনতর কিছু করার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁদের ভাবনা চিন্তা অনেকটা বিপন্ন বোধ করেঙ্গ ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়ঙ্গ কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তরুণ লেখকদের মনে যে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেধেছিল, তা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা — তাঁদের সে সময়ের গল্প উপন্যাসে স্পষ্টত পাওয়া যায়ঙ্গ এ সময়ের বিপন্ন, বিরক্ত লেখকরা বিদেশী সাহিত্যের সে। যোগসূত্রে বিশ্বসাহিত্য সংস্কৃতি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় কিছুটা প্রভাবিত হলেও বস্তুত সোভিয়েত বিপ্লবের শুরু ও সাফল্যে তাঁরা যেন নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছিলেনঙ্গ নতুনতর ভিন্নতর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেনঙ্গ কল্লোলের লেখকদের রচনায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়ঙ্গ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও সমকালীন মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন চল্লিশেক দশকের কথাসাহিত্যিকদের নতুনতর পথের দিশা নিয়ে আসেঙ্গ সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সূচনা পর্বেঙ্গ বাংলার নতুন প্রজন্ম এ সময় নতুন যুগের নতুনতর ধ্যান ধ্যারণায় ছিল উদ্বেলঙ্গ তাঁরা ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের ছত্র ছায়ায় নতুনতর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরী করছেনঙ্গ সুবোধ ঘোষের গল্প 'ফসিল' অবলম্বনে 'অঞ্জনগড়' নাটক অভিনীত হচ্ছেঙ্গ জার্মানীর ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশ্বের নানা দেশের লেখক-শিল্পীরা একত্রিত হয়ে সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারের সঙ্কল্প নিচ্ছেনঙ্গ শহরের সর্বত্র বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে শিল্পী সাহিত্যিকরা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্কট উত্তরণের স্বপ্ন দেখছিলেনঙ্গ ফসিল সেই স্বপ্নের 'ফসল'ঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ হাত ধরাধরি করে সমাজের ধারক সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পেষণ করেঙ্গ তেমনি এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বের পরিচয় তুলে ধরে রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক সুবোধ ঘোষ এই গল্পেঙ্গ 'সুন্দরম' গল্পে এর সে। যুক্ত হয়েছে, মনস্তত্ত্বের অতি গূঢ় কিছু বিশ্লেষণঙ্গ

সুবোধ ঘোষের লেখায় বিশিষ্ট উপকরণ হল মনোবিকলনঙ্গ সেটা কেবলমাত্র সমাজের শিক্ষিত মধ্যবর্গীয় মানুষদের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যতর স্তরের মানুষেরও মনের গভীরে তিনি প্রবেহ করেছেন তাঁর সুবিপুল অভিজ্ঞতার অনুষে।ইঙ্গ ন্যায় ও অন্যায়, নীতি ও নীতিভ্রংশতা, স।ত ও অস।তর সীমারেখা যে বহু সময়েই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, এই সুকঠিন সত্যটিকে তিনি বহুভাবে উদঘাটিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পেঙ্গ আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে সুবোধবাবু অন্বেষর করেছেনঙ্গ দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত অথচ স্থিতপ্রজ্ঞভাবেঙ্গ দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্য তিনি প্রথম বয়সে পেয়েছিলেনঙ্গ হয়ত সেটাই তাঁর এই স্থিতধী দ্রষ্টা রূপে শিল্পীসৃষ্টির অন্তরীক্ষে ছিলঙ্গ

'সুন্দরম' সুবোধ ঘোষের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির অন্যতমঙ্গ শুধুমাত্র এইটুকু বললে হয়ত এর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেওয়া যাবে না, কারণ যদি কেউ এটিকে বাংলাসাহিত্যের সেরা গল্পগুলির বর্গভুক্ত করেন, তাহলে তাঁর সে। দ্বিমত হওয়া খুব কঠিনঙ্গ জীবনের নির্মম কিছু সত্য-উপলব্ধি এবং সামাজিক-অপহৃতকে অবলম্বন করে এই গল্প তৈরি করা হলেও, এর মাধ্যমে যে রূঢ় ব্য।কে উন্মোচিত করা হয়েছে, তার শিল্পগত মূল্যও কিন্তু খুব কম নয়ঙ্গ নৈতিক মূল্যবোধগুলির কীভাবে এই জটিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে অবক্ষয় ঘটে যে, তারও এক সুতীব্র উদঘাটন হয়েছে এই গল্পেঙ্গ গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বর্তমান আলোচনার যাথার্থ ও গল্পের রসাস্বাদন করতে পারবেনঙ্গ

৪১.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

সুবোধ ঘোষের জন্ম বিহারের হাজারিবাগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর (মৃত্যু ১০ই মার্চ, ১৯৮০) তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র ও মা কনকলতাঙ্গ তাঁদের আদি নিবাস অধুনা বাঙলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 'বহর' গ্রামেঙ্গ সতীশচন্দ্র কর্মব্যাপদেশে বিহার প্রবাসী হনঙ্গ তিনি সরকারী জেলের অধঃস্থন কর্মচারী ছিলেনঙ্গ সুবোধ ঘোষ মেধাবী ছাত্র ছিলেনঙ্গ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্য ও তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেনঙ্গ তিনি হাজারিবাগ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারি বাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হনঙ্গ সহাধ্যায়ী বন্ধুর বাবা নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের সে। পরিচয় সূত্রে নৃতত্ত্বে আগ্রহ জন্মেঙ্গ কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনে পনের বছর বয়সেই জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে বাধ্য হনঙ্গ এ সময় তিনি ছ'মাস মেয়াদি প্রথম চাকরি — হাজারিবাগের দেহাতি কুলিবস্তিতে কলেরার মড়ক লাগায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্মী হিসেবে টীকা দেওয়ার কাজ পানঙ্গ এরপর তিনি বিহারের বিখ্যাত লাল মোটর কোম্পানির বাসের নাইট সার্ভিসে কণ্ডাকটর হিসেবে হাজারিবাগ থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে যাতায়াত করতেনঙ্গ এই অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তীকালে 'অযান্ত্রিক' গল্প লেখেনঙ্গ পরে কিছুদিন তিনি সার্কাস পার্টিতেও কায়িকশ্রমের কাজ করেছেনঙ্গ 'অ।দ' গল্পে সে অভিজ্ঞতার ছাপ আছেঙ্গ মাঝে 'হজ' যাত্রীদের টীকা দেওয়ার কাজ নিয়ে বোম্বাই এবং এডেন গিয়েছিলেনঙ্গ কখনো বাড়ী থেকে উধাও হয়ে সন্ন্যাসী'র বেশে অজ্ঞাতবাস বা জিপসী দলের সে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গিয়েছেনঙ্গ অভ্রখানির সেটারকিপার ও সুপারভাইজারিও করেছেন একসময়ঙ্গ আবার স্বাধীন ব্যবসার বাসনা নিয়ে কেক-পাউরুটি-ঘি-মাঘন সরবরাহের ব্যবসাও করেছেনঙ্গ এই সব বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অফুরন্তঙ্গ

অন্তহীন এই চলার পথে ঘুরতে ঘুরতে ঘোষ পরিবারের আকস্মিক ভাবে যোগাযোগ ঘটে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সে।ঙ্গ তাঁরই প্রবর্তনায় সুবোধ ঘোষ শ্রী গৌরা। প্রেসে প্রুফরীডারের কাজ পানঙ্গ ছ'মাস পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় বিভাগে স্থানান্তরিত হনঙ্গ সে ১৯৪০-এর ১লা জানুয়ারীর কথাঙ্গ ঐ একই দিনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন সাগরময় ঘোষঙ্গ আর তখন থেকেই দুজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্বঙ্গ

সুবোধ ঘোষ প্রথম লেখেন 'প্রস্তর যুগের চিত্র কথা' (৪ঠা মে, ১৯৪০)ঙ্গ পরে ভবানীপাঠক ছদ্মনামে লিখেছেন 'ছোটনাগপুরের আদিবাসী' (৩০শে নভেম্বর, ১৯৪০)ঙ্গ তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' ও পরে 'ফসিল' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর জয়যাত্রার শুরুঙ্গ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার

সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম প্রভৃতি লেখার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস লিখেছেনঙ্গ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০টিঙ্গ

তাঁর 'তিলাঞ্জলি', 'ত্রিযামা', 'সুজাতা', 'জিয়া ভরলি' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস খ্যাতিলাভ করেছেঙ্গ তবে ছোটগল্পকার হিসেবেই সুবোধবাবুর ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠাঙ্গ ১৫৭টি গল্প লিখেছেন তিনি সারাজীবনেঙ্গ 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'জতুগৃহ', 'থিরবিজুরী', 'মনভ্রমণ' প্রভৃতি তিরিশটি গল্পগ্রন্থ এবং কতিপয় প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি লিখেছেনঙ্গ

৪১.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়েঙ্গ কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়াঙ্গ এই তোঙ্গ

কিন্তু বাধা আছে — সুকুমারের ব্রহ্মচর্যঙ্গ বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোটা তিলক ধরেছে সেঙ্গ আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় নাঙ্গ সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্যঙ্গ পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকাঙ্গ বাগানের নির্জন পুকুরঘাটে গভীর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্নাঙ্গ প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎস্পর্শ, শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতেঙ্গ

সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভলত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষঙ্গ আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে — মুক্তি দে, মক্তি দেঙ্গ জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসেঙ্গ

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে — বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত, তার পর আর নয়ঙ্গ হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমারঙ্গ

সুকুমারের বাবা কৈলাসডাক্তার বলতেন — প্রোটিনের অভাবঙ্গ পেটে দুটো ভালো জিনিস প,ক, গায়ে মাংস লাগুক, এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবেঙ্গ কত পাকামি দেখলামঙ্গ

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোটবোন রাণু আর ঝি, তাদের মন প্রবোধ মানে নাঙ্গ

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাসডাক্তারকে — যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল আর দেরী নয়ঙ্গ

ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে — ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাসঙ্গ ছোটজাতের ছোটঘরেও কেউ এমন কসাইপনা করে না বাপুঙ্গ

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলোঙ্গ কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেনঙ্গ ভগ্নীপতি কানাইবাবু, সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেনঙ্গ যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারকে সংসারমুখো করবেনঙ্গ

পাশের খবর বেরিয়েছেঙ্গ কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেনঙ্গ নাও, সই করঙ্গ মুন্সেফী চাকরি ঠাট্টার নয়ঙ্গ সংসারে থেকেও সাধনা হয়ঙ্গ ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবেঙ্গ জনকরাজা যেমন ছিলেনঙ্গ

বাড়ির বিষন্ন আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছেঙ্গ কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেনঙ্গ এখন সমস্যা

সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়াঙ্গ কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন — কিছু ভাবনার নেই; সব ঠিক হো যায়েগাঙ্গ

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায়নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ এক-আধটুকু দেখা দিয়েছে যেনঙ্গ

তবু একবার পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সে। সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেলঙ্গ বাড়ির সবারই বুক দুরদুর করে উঠলোঙ্গ ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথমঙ্গ নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছেঙ্গ বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হল বলা তো যায় নাঙ্গ

কিন্তু উপন্যাস না নরকঙ্গ যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনাঙ্গ সমস্ত রাত ঘুম হয়নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছেঙ্গ

সুকুমার বলে — আপনাকে এবার ওয়ানিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবুঙ্গ

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন — আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়ঙ্গ যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যিঙ্গ তা চাড়া ভাল ছবি, ধ্রুবের তপস্যাঙ্গ মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবেঙ্গ

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেন্ট বোধহয় সার্থক হয়ে উঠলোঙ্গ ক'দিন পরেই দেখা গেল, সুকুমার কাব্য পড়ছে, কোন এক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমার যাচ্ছেঙ্গ এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্রও চলে এসেছেঙ্গ

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনিঙ্গ আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়ঙ্গ জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবুফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণে উড়ে চলে যায় — ধুলিধুসর সংসারে বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমার সাঁতার দিয়ে বেড়ায়! একটা বিষন্ন সুখকর বেদনাঙ্গ কিসের অভাবঙ্গ কাকে যেন চাইঙ্গ কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমারঙ্গ

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন — নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল নাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বললো — কানাইবাবু?

— কি?

— মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাইঙ্গ

— নিশ্চয়ঙ্গ কালই চল বারাসাতঙ্গ যাদব ঘোষের মেয়ে বনলতাঙ্গ তোমার মেজদি যেতে লিখেছেঙ্গ আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেনঙ্গ

উকীলের মুহুরী যাদব ঘোষঙ্গ বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালইঙ্গ যাদব ঘোষ অল্প পণে সৎপাত্র খুঁজছেনঙ্গ

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেনঙ্গ — ভাল করে দেখে নে সুকু, মনে যেন শেএস কোন খুঁতখুঁত না থাকেঙ্গ

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছেঙ্গ বিরাট একটা ঝকমকে বেনারসী শাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেটঙ্গ পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে বার করা চুড়ি রুলি বালা ও অনন্ত, কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাতঙ্গ ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপরঙ্গ মেয়েটি দম বন্ধ করে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালোঙ্গ

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন — দেখে নে সুকুঙ্গ গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছিঙ্গ রামোঃঙ্গ

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেনঙ্গ বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেনঙ্গ চোখ মেলে তাকাতে বললেন — ট্যারা কানা নয়ঙ্গ পায়চারি করালেন — খোঁড়া নয়ঙ্গ সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন — দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেইঙ্গ

দেখার পালা শেষ হলোঙ্গ বাড়ি ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন — কি যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে বসে রইলঙ্গ মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়ঙ্গ কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণংঙ্গ

— সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়ঙ্গ — কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেনঙ্গ

পিসিমা — ছেলের আপত্তি তো হবেইঙ্গ হা-ঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী-টুহুরীর স৫। কুটুম্বিতা চলবে নাঙ্গ

সুন্দরী মেয়ে চাইঙ্গ এইটেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনঙ্গ কৈলাসডাক্তার পাত্রী দেখেছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়ঙ্গ তাই কৈলাসডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে নাঙ্গ এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছেঙ্গ প্রথম ছেলে, জীবনসাঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা গ্রাহ্যঙ্গ তারপর আর সকলেরঙ্গ

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপঙ্গ কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তারঙ্গ ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালোঙ্গ যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাসডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেকঙ্গ আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে সেই পীড়িত মর্মের কোন অভিমান আর নেইঙ্গ

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নির্দিষ্ট মনে কৈলাসডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেনঙ্গ এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্যঙ্গ আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়নাঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না, কা'কে সোনার দেহ বলেঙ্গ মানুষের অন্তর। রূপ-এর পরিচয় কৈলাসডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন-জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কৈ? দুঃখ এইটুকুঙ্গ

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপঙ্গ ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্য।মূর্তি কয়েকটি প্রাণীঙ্গ যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়েঙ্গ

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুত করে বসলো একটা ভিখারী পরিবারঙ্গ নোংরা চটের পোটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশঙ্গ সোরগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এলঙ্গ

কৈলাসবাবু বললেন — কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

— এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলেঙ্গ কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছেঙ্গ

কুষ্ঠী হাবু তার পট্টিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো — কৃপা করো বাবা!

— এই বুড়ীটা কে?

— এ মাগীর নাম হামিদাঙ্গ জাতে পশ্চিমা বেদিয়া, বসন্তে কানা হবার পর দলছাড়া হয়েছেঙ্গ ও এখন হাবুরই বৌঙ্গ

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ার জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো — বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠঠি দানা হুজুর!

— আর এই ধিি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেনঙ্গ

— ওর নাম তুলসীঙ্গ হাবু আর হামিদার মেয়েঙ্গ

— আপন মেয়ে?

— হ্যাঁ পিসিমাঙ্গ যদু উত্তর দিলঙ্গ

তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে চুপ করে বসে আছেঙ্গ পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানোঙ্গ আভরণের মধ্যে একটা কৌড়ির তাবিজঙ্গ

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীরঙ্গ বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাে। একটা রূপ পরিপুষ্টিঙ্গ ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীরঙ্গ মোটা থ্যাবড়া নাকঙ্গ মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে বেঁকে গেছেঙ্গ বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছেঙ্গ মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভেঙ্গ এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যাবে, গা শিরশির করবেঙ্গ কিন্তু যদু বললো — তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভরঙ্গ

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনিঙ্গ মিউনিসিপ্যালটিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছেঙ্গ নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানেঙ্গ শহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেইঙ্গ

হাবু কান্নাকাটি করলো — একটা সার্টিফিকেট দিন বাবাঙ্গ মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবোঙ্গ দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁষবো না কখনোঙ্গ তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রাগ বালাই নেইঙ্গ

পিসিমা বললেন — যেতে বল, যেতে বলঙ্গ গা ঘিন্ ঘিন্ করেঙ্গ কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণুঙ্গ

রাণু বললো — আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাইজটা দিয়ে দিইঙ্গ এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবেঙ্গ

— হ্যাঁ দিয়ে দেঙ্গ থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়িও দিয়ে দেঙ্গ বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তোঙ্গ

কৈলাসডাক্তার বললেন — আচ্ছা যা তোরাঙ্গ সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস নাঙ্গ

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবারঙ্গ কৈলাসবাবু হেসে বললেন — দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকেঙ্গ ওরই বিয়ে হয়ে যাবে, জানো?

ঝি উত্তর দিল — বিয়ে হবে না কেন? সবই হবেঙ্গ তবে সেটা আর বিয়ে নয়ঙ্গ

কৈলাসবাবু একটি পাত্রী দেখে এসেছেনঙ্গ নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়াঙ্গ মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুকঙ্গ

দেখানো হল দেবপ্রিয়াকেঙ্গ মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় নাঙ্গ চওড়া কপাল, ছোট চিবুক গোল গোল চোখঙ্গ গায়ের রঙ মেটে, কিন্তু সুমসৃণঙ্গ ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটা ছায়া, প্রচ্ছন্ন এক ম ােলিনীকে ইশারায় ধরিয়ে দিচ্ছেঙ্গ ঠোঁটে হাসি লেগেই আছেঙ্গ সে বোধহয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতইঙ্গ দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভালঙ্গ

সুকুমার হ্যাঁ না কিছুই বলে নাঙ্গ বলা তার স্বভাব নয়ঙ্গ বোঝা গেল, এ মেয়ে তার পছন্দ নয়ঙ্গ

পিসিমাও বললেন — হবেই না তো পছন্দঙ্গ শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় নাঙ্গ তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটোঙ্গ

কৈলাসডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেনঙ্গ সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছেঙ্গ এ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়ঙ্গ নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একেঙ্গ শুধু সুন্দরী হলেই চলবে নাঙ্গ বংশ, বিত্ত,শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবেঙ্গ

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচায্যি আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেনঙ্গ সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠেছেঙ্গ ভটচায্যি বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে গেলেন — নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিসটাঙ্গ কুলনারীর গুণ-লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবেঙ্গ গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব যাচাই করে দেখতে হবেঙ্গ সারাজীবনের ধর্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়ঙ্গ ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই চলবে নাঙ্গ ওসব যাবনিক অনাচার চলবে নাঙ্গ

হ্যাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ইঙ্গ কারণ সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণঙ্গ

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবেচিন্তে, কৈলাসডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেনঙ্গ অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা সুশিক্ষিতা ও সুন্দরীঙ্গ

অনুপমার বয়স একটু বেশিঙ্গ রোগা বা অতি তন্বী দুই-ই বলা যায়ঙ্গ মুখশ্রী আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয়ঙ্গ তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়ঙ্গ রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণেঙ্গ

প্রতিবাদ করলো রাণুঙ্গ — না, ম্যাচ হবে নাঙ্গ যা ঝিরকুট চেহারা মেয়েরঙ্গ

ঋসি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারেঙ্গ হাঁ-না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়ঙ্গ কিংবা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারেঙ্গ তবে তার আচরণেই বোঝ গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়ঙ্গ

পিসিমা বললেন — ভালই হলঙ্গ জানি তো, কী কিপটে এই অনাদি চাষাঙ্গ বিনা খরচে কাজ সারতে চায়ঙ্গ পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছেঙ্গ

দৈবজ্ঞ মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন — পাত্রীর রাশি আর গণ খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমাঙ্গ ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিস নয়ঙ্গ

— সবই গ্রহের কৃপাঙ্গ দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ির সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেলনঙ্গ — যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছেঙ্গ পাতকী রিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছেঙ্গ এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভঙ্গ সুন্দরা রামা, রাজপদং, ধনসুখংঙ্গ আর, অর কত বলবোঙ্গ

— এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেনঙ্গ সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের কাছে বসে আছে তুলসীঙ্গ হাতে কলাই-করা থালাটাঙ্গ

যদু কেত্থেকে এসে একসে। হুমকি দিলঙ্গ — ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদিঙ্গ কেমন ঘাপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরেঙ্গ

কৈলাসডাক্তার বললেন — যাক্, গালমন্দ করিস নেঙ্গ খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বলঙ্গ

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

— আজ্ঞে নাঙ্গ চেষ্টার তো ত্রুটি করছি নাঙ্গ

— চেষ্টা করেও কিছু হবে নাঙ্গ তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেইঙ্গ

— কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিতঙ্গ এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাসডাক্তার বললেন — পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতিঙ্গ ধন্যি বাবা কাশীরামঙ্গ একবার ভাব তো কানাই, কোনো ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চীজ হবে সেটাঙ্গ

কানাইবাবু বললেন — যা বলছেনঙ্গ কত যে বাজে সংস্কারের সাত-পাঁচ রয়েছে লোকেরঙ্গ তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড অবশ্য আছেঙ্গ অ্যানথ্রপলজিস্টরা যেমন বলেন .....ঙ্গ

— অ্যানথ্রপলজিস্ট না চামড়াওয়ালাঙ্গ কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন — আসুক একবার আমার সে। ময়নাঘরেঙ্গ দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছিঙ্গ চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর কে প্রোটো-অস্ট্রালঙ্গ দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদঙ্গ মেলা বকো না আমার কাছেঙ্গ

কানাইবাবু সবে পড়ার পথ দেখলেনঙ্গ

— জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকেঙ্গ বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে! আধুনিক হয়েছে! যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাসডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেনঙ্গ

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যদাসের বাড়িতে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুশি মনে কৈলাসডাক্তার ফিরলেনঙ্গ ফটকে পা দিয়েই দেখলেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সে। হাসি-মস্কর করছেঙ্গ

— এই রাস্কেল সবঙ্গ কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে নিয়ে আর দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেলঙ্গ যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইলঙ্গ কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন — ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুরঘুর করছে এদিকেঙ্গ খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সবের পড়ে, বলা যায় নাঙ্গ

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন — সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলামঙ্গ একরকম

পাকা কথাই দিয়ে এসেছিঙ্গ এবার সুকুমার আর তোমরা দেখে এসঙ্গ আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও নাঙ্গ

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলোঙ্গ মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে, সন্দেহ নেইঙ্গ যেন একটি অমাবস্যা কুমারী, ঘুটঘুটে কালোঙ্গ সমস্ত-অবয়বে একটা সুপেশল কাঠিন্যঙ্গ মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত হাড় আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকে লজ্জা দেয়ঙ্গ চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর মেঘস্তবকের দৃশ্যটা মনে পড়িয়ে দেয়ঙ্গ মূর্তির শিল্পীর অবশ্য খুশি হয়ে বলবেন, এ যেন এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তিঙ্গ মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হলঙ্গ বরমালা-কাঙাল অবলার দৃস্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসা যেন জ্বলজ্বল করছে মমতার দুই চোখেঙ্গ

সত্যবাবু গুরপনার পরিচয় দিলেন — বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভালঙ্গ ছাত্রীজীবনে প্রতিবছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছেঙ্গ

মেয়ে দেখে এসে সুকমার মুখভার করে শুয়ে রইলঙ্গ রাণু বললো — এ নিশ্চয় রাক্ষসগণঙ্গ

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন — হ্যাঁ, সেই তো কথাঙ্গ বড় হট্টাকট্টা চেহারাঙ্গ নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীওঙ্গ

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেনঙ্গ মমতারই সৎ। বিয়ে একরকম ঠিকঙ্গ এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনিঙ্গ দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন নাঙ্গ

কিন্তু যা কখনও হয়নি, তাই হলঙ্গ সুকুমারের প্রকাশয বিদ্রোহঙ্গ সুকুমার এবার মুখ খুলেছেঙ্গ রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে — সত্যদাসের সৎ। বড় গলাগলি দেখছি, বাবার! ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগেভাগে আমায় জানাবিঙ্গ আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছিঙ্গ

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলোঙ্গ সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সৎ। একপ্রস্থ বাকযুদ্ধ সেরে এলেনঙ্গ কিন্তু ফল হল না কিছুইঙ্গ কৈলাসবাবু এবার অটলঙ্গ

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন — ঐ হদকুচ্চিত মেয়ের সৎ। বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিমটে দিয়ে বিদেয় করে দাও নাঙ্গ

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হল না কিছুইঙ্গ তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেনঙ্গ

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বললো — সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তোঙ্গ

— কোন্ দৈবজ্ঞী?

— ঐ যে বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিলঙ্গ জিভ উপড়ে ফেলবো ওরঙ্গ

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাসডাক্তার শুনলেন এ বার্তালাপঙ্গ রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁরঙ্গ সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন — কি পেয়েছঙ্গ

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন — কি হয়েছে?

— ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

— কেন দেব না?

— সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন — সুন্দরী পাত্রীঙ্গ

— বেশ তবে লিখে দাও আমাকে, সুন্দরী কাকে বলেঙ্গ তন্বী শ্যামা পক্কবিম্বাধর, আরও যা আছে সব লিখে দাওঙ্গ আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবোঙ্গ

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মা'র মেজাজও ধৈর্য হারাবার উপক্রম করলোঙ্গ তবু মনের ঝাঁজ চেপে নিয়ে বললেন — তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না, আমরা দেখছিঙ্গ

— ধন্যবাদঙ্গ খুব ভাল কথাঙ্গ এবার তা হলে আমি দায়মুক্তঙ্গ

— হ্যাঁঙ্গ

কৈলাসডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেঙ্গ হাসপাতালে যান আসেনঙ্গ রুগী নিয়ে, ময়নাঘরের লাশ নিয়ে দিন কেটে যায়ঙ্গ যেমন আগে কাটতোঙ্গ

বাগানের দিকে একটা হট্টগোলঙ্গ কৈলাসডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদুডোম আর নিতাই তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছেঙ্গ

— কি ব্যাপার নিতাই?

— বড় পাজি এ ছুঁড়িটা, হুজুরঙ্গ পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলঙ্গ আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছেঙ্গ

কৈলাসডাক্তার বললেন — বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়িরঙ্গ ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরে মত মাথায় চড়েঙ্গ কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজরঙ্গ এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবিঙ্গ

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কয়েকটা ইটপাটকেল ছুঁড়ে চলে গেলঙ্গ কৈলাসডাক্তার বললেন — সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবেঙ্গ

সেদিনই সন্ধ্যেবেলাঙ্গ অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ি ফিরতেই কৈলাসডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে-টিপে সরে পড়ছে তুলসীঙ্গ কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেলঙ্গ কৈলাসডাক্তার হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হল লাঠি হাতেঙ্গ

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লোঙ্গ

কৈলাসডাক্তার সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখলেনঙ্গ — আমার ঘরটা সব তছতছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাসডাক্তারঙ্গ কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হলঙ্গ

পরের দিনঙ্গ দিনটা আজ ভাল নয়ঙ্গ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছেঙ্গ কানাইবাবু এসে কৈলাসডাক্তারকে জানালেন — সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছেঙ্গ জগৎ ঘোষের মেয়েঙ্গ সুকুমার এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছেঙ্গ বংশের শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেইঙ্গ

কৈলাস ডাক্তার বললেন — বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবরঙ্গ

— আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবেঙ্গ

— তা, যাবঙ্গ

যদুডোম এসে তখুনি খবর দিলে, তিনটে লাল এসেছে ময়না তদন্তের জন্যঙ্গ কৈলাসডাক্তার বললেন — চল রে যদুঙ্গ এখনি সেরে রাখিঙ্গ রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছেঙ্গ

ময়না ঘরে এসে কৈলাসডাক্তার বললেন — বড় মেঘলা করেছে রেঙ্গ পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বেলে দেঙ্গ

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — রাত হবে নাকি রে যদু?

— আজ্ঞে নাঙ্গ দুটো আগুনে পোড়া লাশ, পচে পাঁক হয়ে গেছেঙ্গ ও তো জানা কেস, আমি চিরে ফেড়ে দেবঙ্গ বাকি একটা শুধু ....ঙ্গ

— নে কোনটা দিবি, দে! কৈলাসডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেনঙ্গ

লাশের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাসডাক্তার চমকে উঠলেন — অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলঙ্গ কৈলাসডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো — হ্যাঁ হজুর, তুলসীই, সেই ভিখিরী মেয়েটাঙ্গ

কৈলাসডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেনঙ্গ যদু চটপট হাত চালিয়ে তুলসীর নোংরা শাড়ীটা আর গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলঙ্গ আবার বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই কৈলাসডাক্তার বললেন — যাচ্ছিস কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাশটা মোছ ভাল করেঙ্গ ইউক্যালিপটাসের তেলের বোতলটা দেঙ্গ কিছু কর্পুর পুড়তে দে, আরও একটা বাতি জ্বালঙ্গ

— ওয়ান মোর আনফর্চুনেটঙ্গ

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিলঙ্গ তুলসীর লাশে হাত দিলেন কৈলাসডাক্তারঙ্গ

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হলঙ্গ কৈলাসডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাশের উপরঙ্গ গলাটা চিরে দেওয়া হলঙ্গ সাঁড়াশি দিয়ে পটপট করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাসডাক্তারঙ্গ

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতাঙ্গ চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাসডাক্তার দেখলেন, নিশ্চল দুটি কণীনিকার যেন নিদারুণ কোন অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছেঙ্গ শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেতপটলঙ্গ সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণঙ্গ

— ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুবঙ্গ কৈলাসডাক্তার বললেনঙ্গ

যদু বললো — হ্যাঁ হুজুর, কাঁদবেই তোঙ্গ সুইসাইড কিনাঙ্গ করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়ঙ্গ তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরেঙ্গ

— গলা টিপে মারেনি তো কেউ? কৈলাসডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেনঙ্গ কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন নেইঙ্গ গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্লঙ্গ অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকাঙ্গ

— এত লালা! মরবার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরেঙ্গ

— হ্যাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরেঙ্গ

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাসডাক্তারঙ্গ তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসীঙ্গ কত রূপসী কুলবধূর, কত রূপাজীবা নটীর লাশ পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়েঙ্গ তিনি দেখেছেন তাদের অন্তর। রূপ, ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়োঙ্গ তুলসী হার মানিয়েছে সকলকেঙ্গ অদ্ভুতঙ্গ

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার তাকিয়ে রইলেন — প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরা।ের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপঙ্গ এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়ঙ্গ রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লীঙ্গ আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশির জালঙ্গ

কৈলাসডাক্তার তেমনই বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন — থরে বিথরে সাজানো সারি সারি রক্তিম পর্শুকাঙ্গ বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটেঙ্গ মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকাঙ্গ

কৈলাসডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে আর দুচোখ অপলক করে দেখতে থাকেন — খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকাঙ্গ প্রশান্ত মুকুটধমনীঙ্গ সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদঙ্গ গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলোঙ্গ

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাসডাক্তারঙ্গ কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে? তবুও এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিনঙ্গ আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদাঙ্গ নতুন অনুরাগের তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিনঙ্গ যাক্

কৈলাসডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেনঙ্গ যদু বললো — এ সবে কোন জখম নেই হজুরঙ্গ পেটটা দেখুনঙ্গ

ছুরির ফলার এক আঘাতে দুভাগ করা হল পাকস্থলীঙ্গ এইবার কৈলাসডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়ঙ্গ ক্লোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড — সন্দেহ পাউরুটি আর ... আর বেলেডোনাঙ্গ

— মার্ডারঙ্গ

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপরঙ্গ সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাসডাক্তারঙ্গ

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাসডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করেঙ্গ পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপরঙ্গ

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাসডাক্তারঙ্গ ছোঁ মরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেনঙ্গ নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন, পরিশুল্কে ঢাকা সুডৌল সুকোমল একটি পেটিকাঙ্গ মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রীঙ্গ সর্পিল নাড়ীর আলি।নে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে একটি শিশু এশিয়াঙ্গ

আবেগে কৈলাসডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থরথর করেঙ্গ যদু এসে ডাকালো — হুজুরঙ্গ

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে তিনিই সহিসের পাশে বসলোঙ্গ

নিতাই জিজ্ঞেস করে — এত দেরী কেন রে যদু?

— শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছেঙ্গ

৪১.৫ সারাংশ

একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির এক অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে সুকুমারঙ্গ বাবা কৈলাসবাবু মফঃসল শহরের সরকারী ডাক্তারঙ্গ বাড়ির অন্য সকলে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের লোকজন যেমন হয়, তেমনইঙ্গ ব্যতিক্রম শুধু সুকুমারঙ্গ অকৈশোর ব্রহ্মচর্য এবং সংযম তার বাতিকে পরিণত হয়েছেঙ্গ তার বাবার মতে সেটা আসলে নিরামিষভোজী সুকুমারের শরীরে প্রোটিন পদার্থের ঘাটতিজনিত কারণেঙ্গ এ হেন সুকুমার পড়াশুনো শেষ করে চাকরী পাবার পথেঙ্গ হবু-মুন্সেফ সায়েবের জন্য পাত্রী খোঁজ শুরু হয় কাজেকাজেইঙ্গ আপাদমস্তক ব্রহ্মচর্যের বর্ম-আঁটা সুকুমারকে সংসারদুরস্ত জ্ঞানগম্যি দেবার জন্য তার জামাইবাবু কানাই তাকে নভেল পড়ান, সিনেমায় নিয়ে যান জোর করেঙ্গ প্রথম প্রথম সুকুমার রাগ-বিরক্তি দেখালেও অচিরেই নমনীয় হয়ে আসে এবং বাড়ির লোকে প্রবল উদ্যমে পাত্রী দেখতে ও সুকুমারকে দেখাতে থাকেনঙ্গ

৮২৮

মূল সমস্যার সূত্রপাত এইখানেঙ্গ পিসিমা, মা, বোন, দিদি, জামাইবাবু মায় বাড়ির পুরনো পরিচারিকা অবধি প্রত্যেকেই নিজস্ব নানান মাপকাঠিতে সম্ভাব্য পাত্রীদের দোষগুণ নির্ণয় করে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করতে চানঙ্গ সে। মদত জোগান কুলপুরোহিত, এমনকি এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতওঙ্গ এঁদের বহুবিচিত্র চাহিদা এবং নানাবিধ মানদণ্ডে বিচারের ফলে পাত্রের পিতা হিসেবে কৈলাসবাবু একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েনঙ্গ কারুর বক্তব্য সুন্দরী বউ আসা দরকার, কেউ চান বংশগৌরবসম্পন্না কনে, কারুর অভিপ্রায় ভাল মতো পাওনা-থোওনা, কারুর আর কিছুঙ্গ কেবলমাত্র সুকুমারেরই মন বোঝা দায়, সে যে কী চায়, তা বোঝা দুরূহঙ্গ ফলে পুতুলসাজানো পনের বছর বয়সী বনলতা মুহুরীর মেয়ে বলে নাকচ হয়ে পিসিমার কাছে; সুকুমারও মুখবার করে থাকে, অর্থাৎ অপছন্দঙ্গ দেবপ্রিয়া ভাল গান গায় বটে, কিন্তু সে হল মেদস্বিনী পৃথুলা এবং মোঙ্গলীয় ছাঁদের মুখচোকঙ্গ সুতরাং সেও নাকচঙ্গ অনুপমা শিক্ষিতা এবং সুশ্রী, কিন্তু অতযন্ত রোগাটে চেহারার মেয়ে, তার ওপরে বাপের কৃপণতার অখ্যাতি আছেঙ্গ অতএব প্রথম কারণে সুকুমারের, দ্বিতীয় কারণে পিসিমার আপত্তিঙ্গ সুতরাং বাতিল সেওঙ্গ মমতা স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু পুরুষালি অপেলব চেহারা, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণাঙ্গ অবশ্য স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মেয়েঙ্গ কিন্তু সেটা তাকে পাশমার্কা পাওয়ালো না পিসিমা, মা, রাণু, সুকুমার — কারুর কাছেইঙ্গ

কৈলাসবাবুর গায়ের রংও হাকুচ কালো — মন্দ লোকে নষ্টামি করে তাঁকে ''জিভ কালো ডাক্তার'' বলেও উল্লেখ করেঙ্গ তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না বাড়ির লোকের কাছে সৌন্দর্যের বিচারটা ঠিক কীভাবে হয়ঙ্গ ফলে স্ত্রীর সে। বিতণ্ডা এবং পাত্রীনির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাঁর অব্যাহতি লাভঙ্গ ওদিকে সুকুমার ছোট বোন রাণুর মারফতে প্রায়ই ভয় দেখায় যুদ্ধের চাকরী নিয়ে চলে যাবে (এই গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন)ঙ্গ

৮৩৮

এরই পাশাপাশি, আর একটি কিশোরী মেয়েও বারবার এসে উপস্থিত হয় কাহিনীর মধ্যেঙ্গ তার নাম তুলসী — কুষ্ঠরোগী হাবু আর বেদেনী হামিদার মেয়েঙ্গ

ভিখারিনী কিশোরীটিকে কুদর্শনা বললে খুব কমই বলা হয় তার চেহারার সম্পর্কেঃ ''বছর চৌদ্দ বয়স,

তবু সর্বা। একটা রূঢ় পরিপুষ্টিঙ্গ ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মতো কালি-মাড়া শরীরঙ্গ মোটা থ্যাবড়া নাকঙ্গ মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে-বেঁকে গেছেঙ্গ বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছেঙ্গ মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে চুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভেঙ্গ''

এই তুলসী প্রথমবার কৈলাসবাবুর বাড়ি আসে বাপ-মায়ের স। তাঁর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট চাইতে, যাতে ওরা মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনে থাকতে পারেঙ্গ এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই তুলসীকে দেখা যায় — কৈলাসডাক্তারেরও নজরে পড়ে বাড়ির আশেপাশে যে ঘোরাঘুরি করে, বসে থাকে বাগানেঙ্গ একদিন তাকে দেখা গেল ক্ষিপ্ত মূর্তিতে ঢিল ছুঁড়তে — যদু ডোম এবং নিতাই সহিস ঠেকাতে গেলে তাদের হাতে কামড়েও দেয় সেঙ্গ এর আগে একবার অবশ্য কৈলাসবাবুর নজরে পড়েছিল ঐ নিতাই এবং যদু তুলসীর স। বসে-বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেঙ্গ আজকে একেবারে অন্য মূর্তিঙ্গ এরও পরে এক সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে কৈলাসডাক্তার দেখলেন চোরের মতো পা টিপে টিপে অন্ধকারে ফটক খুলে সরে পড়ছে তুলসীঙ্গ তাঁর রোগী দেখার জন্য বৈঠকখানা ঘর, সুকুমারের পড়ার ঘর সব খোলা পড়ে রয়েছেঙ্গ তাঁর ঘরটা তছনছ হয়ে রয়েছে, হারিয়েছে নতুন কোন বেলেডোনার শিশিটাঙ্গ বিশেষ কিছু চুরি টুরি হয়নি অবশ্যঙ্গ

এইসব তুলসী-কাণ্ডের স। সমান্তরালভাবে চলতে থাকে সুকুমারের বিয়ের তোড়জোড়ঙ্গ স্ত্রীর স। ছেলের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করে কৈলাসডাক্তার অবশয রেহাই পেয়েছেন পাত্রী বাছাইয়ের জটিল দায়িত্ব থেকেঙ্গ কারণ, বাড়ির সকলের স। সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে তাঁর প্রবল মতানৈক্য! চুল কালো হলে সুন্দর, আর চামড়া কালো হলে নয় — এই ব্যাসকূট কৈলাসবাবু বুজে উঠতে পারেন নাঙ্গ অবশেযে তাঁকে বাদ দিয়েই অন্যরা সুন্দরী সুপাত্রীর সন্ধান জোটান মায়, আশীর্বাদেরও তারিখ ঠিক হয়ে যায়ঙ্গ

যে রাত্রে কন্য আশীর্বাদের বন্দোবস্ত হয়, ঠিক সেদিন সন্ধ্যাতেই সরকারী ডাক্তার কৈলাসবাবুর ডাক পড়ে শহরের মর্গ থেকে — তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ময়নাতদন্তের জন্যঙ্গ সেখানেই আচমকা, অবিশ্বাস্যভাবে তুলসীর মৃতদেশের সম্মুখীন হলেন তিনি কৈলাস ঃ স্তম্ভিতপ্রায় বিমূঢ়তার মধ্যে কৈলাসবাবু আবিষ্কার করেন তুলসীর কুৎসিৎ-দর্শন বহির।ের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য, এবং তার পাকস্থলীর মধ্যে পাউরুটি -সন্দেশ-বেলেডোনার দলা; .... এবং একটি প্রস্তূয়মান মানব-ভ্রূণঙ্গ অপলক দৃষ্টিতে কৈলাস তাকিয়ে থাকেন সেদিকেঙ্গ মর্গের দরজার পাল্লার ওপর থেকে সরকারী ডোম যদু এবং ডাক্তারের টমটম গাড়ির সহিস নিতাই নিজেদের মধ্যে সবিদ্রুপ-রসিকতায় মেতে ওঠে ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছেঙ্গ''

৪১.৬ প্রাস।িক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের বিশ্লেষণ করতে হলে অনিবার্য ভাবেই সেটি দ্বিমাত্রিক হয়ে পড়বেঙ্গ একদিকে রয়েছে এর সামাজিক দিক, অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক একটি প্রেক্ষিতঙ্গ সমাজ-মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব-এ দুইয়েরই অন্বেষণ এই কাহিনীর মধ্যে করতে হয়ঙ্গ সুকুমারের জন্য বিয়ের পাত্রী খোঁজার আপাত-হাস্যকর পরিস্থিতির আড়ালে যে নির্মম সামাজিক মানসিকতাটা লুকিয়ে রয়েছে, তাকে আমাদের সামনে অনাচ্ছাদিত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ বারবারইঙ্গ বংশকৌলীন্য, কাঞ্চনকৌলীন্য ইত্যাদি তো আছেই; তারই স।-স। ডাক্তারবাবুর বোন, স্ত্রী, কন্যা মায় প্রাচীনা পরিচারিকা পর্যন্ত (পুরোহিত-দৈবজ্ঞদের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়) যেভাবে আরো নানান চাহিদার ফর্দ বাড়িয়ে গেছেন ক্রমান্বয়ে, তাতে তাঁরা যে ঠিক কী চান — সেটা বুঝে ওঠা নেহাৎই কঠিনঙ্গ রূপ-লাবণ্য নিয়েও তাঁদের যে-বহুবিধ খুঁতখুঁতুনি, সেটাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্যঙ্গ

আসলে, আমাদের সামাজিক কাঠামোয় মেয়েদের যে এক ধরনের 'বিড়ম্বনা' (অথবা, অর্থনীতির পরিভাষায় বললে — 'ভোগ্যপণ্য', ওরফে 'কমোডিটি') বলেই গণ্য করা হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, এই গল্প তার সপক্ষে একটি তাৎপর্যময় দলিল হয়ে আছেঙ্গ এইজন্য কনের তথাকথিত সৌন্দর্য, তার পিতার অর্থ-সামর্থ্য এবং জাঁক করে বলার মতো পারিবারিক পরিচয়কে এত বড় করে দেখা হয়ে থাকেঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে, মেয়েদের এই অবমাননার (না-কি, অবমূল্যায়নের) মূল হোত্রী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোদ মেয়েরাইঙ্গ এই গল্পের পিসিমা-প্রমুখ পাশ্বচরিত্রগুলি তারই প্রমাণস্বরূপঙ্গ

সমাজ-মানসিকতার এই কদর্য দিকটি যেমন এ গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে তেমনই আবার এক জাতীয় শ্রেণীশোষণও এর মধ্যে রূপায়িতঙ্গ মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রে যে সবসময়েই একটা টানাপোড়েন বা স্ব-বিরোধী প্রবণতা থাকে, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এখানে স্বয়ং কৈলাসডাক্তারঙ্গ তিনি সৌন্দর্যের অলীক মানদণ্ড হাতে নিয়ে বিচার করেন না, ফর্দ মিলিয়ে যে রূপ লাবণ্যের হিসেব হয় না, তা তিনি স্পষ্টই বলেন এবং এই সব নিয়ে বাড়ির আর সকলের সে। তাঁর বিরোধটাও বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমেঙ্গ

এরই অনুষে। 'সুন্দর' কী — সেই অত্যন্ত জটিল প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠেঙ্গ বস্তুতপক্ষে 'সুন্দর' কথাটি একান্তভাবেই আপেক্ষিক, কেননা, একের চোখে যা সুন্দর, অন্যের চোখে তা আদৌ সুন্দর না হতেও পারেঙ্গ ঠিক একই রকমের মতপার্থক্য 'অসুন্দর' বা কুৎসিৎ সম্পর্কেও ঘটতে পারেঙ্গ এই সত্যটিকেই এই গল্পের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিভাজনের প্রেক্ষিতে সংঘটিত একটি গুরুতর নৈতিক অপহ্নবের সে। সমান্তরালভাবে ব্যক্ত করেছেনঙ্গ সুন্দর কী; সৌন্দর্য কাকে বলে? কৈলাস ডাক্তার নানাভাবে সে প্রশ্ন কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরেছেনঙ্গ যেমন—

ক — ''চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত — এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে শাশ্বত কালি দিয়ে?''

খ — (কানাইবাবু অ্যানথ্রপলজিস্টদের মত উদ্ধৃত করার চেষ্টা করে মানুষের রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে অভিমত দেবার প্রয়াস পেলে, তার জবাবে) ''আসুক একবার আমার সে। ময়নাঘরেঙ্গ দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছিঙ্গ চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রালঙ্গ দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদঙ্গ''

গ. — ''প্রবালপুষ্পের মালঞ্চের মত বরা।ের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপঙ্গ এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়ঙ্গ রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লীঙ্গ আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সূক্ষ্ম কৈশিক জালঙ্গ ... কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে?'

মানুষের রূপের বহির। যেটা সেটা সাজসজ্জা, রং-পালিশে আপাত-মনোহারী করে তোলা যায়ঙ্গ কিন্তু বহিরে। চূড়ান্ত কুৎসিত তুলসীর ব্যবচ্ছিন্ন মৃতদেহের অন্তর্লোকে যে সুস্বাস্থ্য এবং পবিত্র রূপটি লুকিয়ে আছে মানুষের আসল সৌন্দর্য সেখানেই, কৈলাসডাক্তারের এই অনুভবটুকুকে লেখকও প্রচ্ছন্ন সমর্থক জ্ঞাপন করেছেনঙ্গ রূপাজীবা নটী কিংবা রূপসী কূলবধুর মৃতদেহেরও ময়নাতদন্ত করেছেন কৈলাস; তাদের কারুরই ব্যবচ্ছিন্ন শবের অভ্যন্তরে 'কুদর্শনা' এই তুলসীর মতো 'ভিন্নতর' সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পাননিঙ্গ তাই, এই প্রেক্ষিতে সৌন্দর্য কাকে বলে — সে বিষয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞানকে খুঁজে পেয়েছেন কৈলাস; এবং অবশ্যই লেখকওঙ্গ

এই অনুষ েই ‘সুন্দরম’ শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বিচার্যঙ্গ এই গল্পের নাম ‘সুন্দর’ হলে সেই তাৎপর্য অণ্বেষণের কোনো প্রয়োজন ঘটত নাঙ্গ কিন্তু নাম যেহেতু ‘সুন্দরম’ — তাই সেই শব্দের ব্যঞ্জনা কী, ‘সুন্দর’ শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যানের মাধ্যমে সেটা অনুভব করা সম্ভব নয়ঙ্গ

‘‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম’’—ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় এই কথাটি বহু-প্রচলিত, বহুল-প্রচারিতঙ্গ যা ‘সত্য’, তাই ম ালময় (অর্থা, ‘শিব’) এবং সেটিই হল সুন্দরঙ্গ সত্য, শুভ এবং সুন্দরের এই অভিন্নতার ধারণাকে এখানে তির্যক বিদ্রূপে খানখান্ করে ভেঙে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষঙ্গ এই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ‘সত্য’ মানেই যে — ‘সত্য’ মাত্রেই যে, ম ালসূচক নয়, সুন্দরও নয় — পরোক্ষ ই িতে সেই নির্মম কথাটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন গল্পের এমন শিরোনামের মাধ্যমেঙ্গ তুলসীর প্রতি যে ভয়ঙ্কর এক অন্যায় করা হয়েছে, কাহিনীর শেষ পর্বে তো তা দিবালোকের মতোই সুস্বচ্ছঙ্গ কিন্তু সেই ‘সত্য’ (কঠিন নিশ্চয়!)কিন্তু ম ালপ্রদ কিংবা সুন্দর নয়ঙ্গ ‘সুন্দরম নামের এমন তির্যক প্রয়োগের সাহায্যে তিনি সেটিই মর্মান্তিক শ্লেষের স ে ব্যক্ত করেছেনঙ্গ যে তিক্ত বিদ্রূপ যদু ডোমের কণ্ঠে ঝন্ঝন্ করে বেজে উঠেছে গল্পের শেষ পংক্তিতেঙ্গ ঠিক তারই সমধর্মী একটি ধিক্কার যেন এই ‘সুন্দরম’ শব্দের মাধ্যমে সুবোধবাবুর কলমে ঝড়ে পড়েছেঙ্গ..... হয়ত ‘সুন্দরমঙ্গ’’ কিংবা ‘সুন্দরম?’ এই চেহারায় এ গল্পের নামকরণটা করলে তাঁর অভীষ্ট শ্লেষের ব্যঞ্জনাটুকু সোচ্চারভাবে ফুটে উঠতঙ্গ কিন্তু তা না করে, তিনি ওটুকু পাঠকের অনুভবশক্তির ওপর ভরসা রেখে সাদামাটা ভাবেই শুধু ‘সুন্দরম’ লিখে ছেড়ে দিয়েছেনঙ্গ

গল্পের মধ্যে আরও একটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ সংকেত অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষঙ্গ তুলসীর গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে একটি অপ্রত্যাশিত বিশেষণে মণ্ডিত করেছেন তিনি ঃ (শিশু) এশিয়াঙ্গ এই আপাত অসংলগ্ন শব্দটি ব্যবহার করে তিনি আর এক ব্যঞ্জনায় শোষণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে বাঙ্ময় হয়েছেনঙ্গ ধর্ষিতা এবং প্রতারিতা ভিখারিণী কিশোরী তুলসীর ভ্রূণদেহী সন্তানকে ‘‘এশিয়া’’ বলে অভিহিত করে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে লাঞ্ছিত এশিয়ার মানুষের স ে তার তুলনা করেছেনঙ্গ গভীর তাৎপর্যময় এই শব্দটি এখানে কাহিনীকে একটা অন্যতর মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে সন্দেহ নেইঙ্গ

[প্রস াত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতিকালে সুবোধ ঘোষের গল্পসমগ্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ‘‘এশিয়া’’ শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে ‘‘আশা’’ রূপেঙ্গ এই রূপান্তরণ কেন এবং কীভাবে, তার কিছু ব্যাখ্যা নেইঙ্গ এটা সুবোধবাবুর অনুমোদিত কি-না, সেটিও অনুল্লেখিতঙ্গ এর ফলে গল্পের একটি বিশিষ্ট ভাবমাত্রার ব্যঞ্জনা পরিবর্তিত হয়েছে অবশ্যইঙ্গ ‘আশা’ কেবলমাত্র তুলসীর অবোধ-ভাবনার প্রেক্ষিতেই ব্যঞ্জনাময়ঙ্গ কিন্তু ‘এশিয়া’-র ভাবগত সংকেত সুদূরবিস্তারীঙ্গ]

এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সুকুমার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঙ্গ তার (আপাত) ব্রহ্মচর্যের ভড়ং করা তারপরে দু-চারটে নভেল পড়ে এবং সিনেমা দেখেই জীবনের ভোগ-সুখ ইত্যাদিতে আগ্রহী হওয়া, রূপসী পত্নী না-জুটলে যুদ্ধে সার্ভিস নেবার ভয় দেখানো বাড়ির লোককে এবং রূপ-গুণ-বংশকৌলীন্য-বিত্তস্বাচ্ছল্য ইত্যাদির জন্য তাঁদের বাছাবাছির বিলম্ব সইতে না-পেরে কুৎসিতা ভিখারিণী কিশোরী (যে, কুষ্ঠরোগীর কন্যাও বটে) তুলসীকে প্রলুব্ধ করে তার সর্বনাশ করা এবং পরিশেষে কেলেংকারি ঢাকতে তাকে গর্ভবতী অবস্থায় খুন করা — ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সুকুমারের চরিত্রের ভণ্ড, কামুক এবং হিংস্র রূপগুলি পরের পর ঝিলিক দিয়ে যায়ঙ্গ সুবোধবাবুর অসামান্য শিল্পকৃতিত্ব এইখানেই যে, গল্পের শেষ পংক্তিতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সুকুমারের এই মুখোসটা খসে পড়ে নাঙ্গ একটা বিচিত্র উৎকণ্ঠা কাহিনীর শেষ পর্যন্ত তিনি টানটান করে রেখেছেন — বিশেষত তুলসীর অপঘাতে মৃত্যু এবং তার গর্ভে মৃত ভ্রূণ দেখার পর থেকেঙ্গ অথচ এই

কাহিনী শুরু হয়েছিল বেশ একটা হালকা পরিহাস বিজল্পিত ভীতেই — বিশেষত সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের হাস্যকর ভড়ঙের বর্ণনার অনুষ।ঙ্গ

বারংবার পাত্রী দেখানোর যে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই গল্পের মধ্যে ক্রমান্বয়ে করা হয়েছে, সেখানেও এই ধরনের ব্য। মনস্কতার ইি।তি মেলেঙ্গ আবার তারই পাশাপাশি সুকুমারের পিসি, মা, বোন, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ প্রমুখের কথাবার্তার মাধ্যমে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ঠিক কথখানি অবমাননা সইতে হয় এবং ছেলের বিয়ে উপলক্ষে কেমনভাবে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যার মালিকানা অর্জনের লোলুপ অপচেষ্টা চলে, তারও নিখুঁত এবং তীব্র প্রতিবেদন করেছেন গল্পকারঙ্গ আর সেই সূত্রেই এইসব পার্শ্বচরিত্রগুলির ছোট-ছোট স্কেচ এঁকে গেছেন তিনিঙ্গ মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যেসব হীনতা, লোভ এবং দৈন্য লুকিয়ে থাকে, তাদেরকে অনাবৃত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ এভাবেইঙ্গ

মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের আরেকটি দিকের প্রতিনিধি হলেন কৈলাস ডাক্তারঙ্গ তিনি উদারচেতা, স্পষ্টবক্তা এবং সংস্কারবিমুক্ত মানুষঙ্গ পরোপকারী, দয়ালু এবং সংবেদনশীল এক জনহিতব্রতী চিকিৎসকঙ্গ সুকুমারের ব্রহ্মচর্যের নামে আধ্যাত্মিক ভাবালুতার ভণ্ডামি, বাড়ির সকলের হীনতা-দীনতা-লোলুপতা এবং নারীর রূপ-সম্পর্কে অনির্দেশ্য কিছু বিচারপদ্ধতির অসারতা — এই সমস্ত কিছু ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ, নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর ছেলের বিপ্রতীপ মেরুতে প্রতিষ্ঠিত করেঙ্গ বস্তুত, মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যে একটি প্রতিবাদী প্রগতিশীল মানসিকতা ক্রিয়াশীল থাকে, সেটারই প্রমাণ হিসেবে কৈলাসবাবুকে গ্রহণ করলে ভুল হবে নাঙ্গ

আর্ত-সামাজিকভাবে অবরবর্গীয় — সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় সাক-অল্টার্ন-বলে গণ্য যে — চরিত্রগুলি গণ্য এই কাহিনীতে, তাদেরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তুলসীঙ্গ অবশ্য এই গল্পের কোথাও তার মুখে একটি শব্দও শোনানি আমাদেরকে লেখক, যদিচ পরিণামে তার মাধ্যমেই তারসপ্তকে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে লেখকের অভীপ্সিত বক্তব্যঙ্গ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যৌবনতৃষ্ণা এবং বোধবুদ্ধির ক্ষীণতা — এই সব কিছু একসে। মিলেমিশে গিয়ে তার 'প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করেঙ্গ'' তুলসীর জীবনের যে করুণ এবং ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি, তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী অবশ্যই সুকুমার, পরিণাম বোধহীন, নাবালিকা তুলসীর দায় সেখানে অনেক লঘুঙ্গ তবে, সুকুমার এখানে একক নয়; তুলসীর এই মর্মান্তিক পরিণতির অন্তরালে ডাক্তারবাবুর বাড়ির সকলের দায়িত্বও কিছু কম নয়ঙ্গ তাঁদের খুঁতখুঁতানি এবং মাত্রাছাড়া 'লাভের' আকাঙ্খার ফলে সুকুমারের বিয়েটা পেছিয়েছে যতই, ততই ভিতরে-ভিতরে সুকুমারও অধৈর্য হয়ে উঠেছেঙ্গ অবশ্য সুকুমারের 'রূপ-তৃষ্ণা'-ও তার বিয়ের ফুল ফোটার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছেঙ্গ

এইখানেই মানবচরিত্রের এক বিচিত্র এবং অব্যাখ্যেয় রহস্য লুকিয়ে আছেঙ্গ বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতা প্রমুখ মেয়েরা তার পছন্দ হয়নি তার এবং তার বাড়ির লোকের বিচারে 'সুন্দরী' নয় বলেঙ্গ অথচ সর্বজনীন নিরিকেই কুরূপা বলে গণ্য তুলসীকে উপলক্ষ করে তার কাছে প্রত্যাশিত সুশালীন নৈতিকতা এবং সংযমবোধ চুরমার হয়ে গেল — যার মর্মন্তুদ পরিণাম তুলসীর গর্ভবতী হওয়া এবং (বিষাক্ত) সুখাদ্যের প্রলোভনে অপঘাতে মরাঙ্গ

তুলসী হতদরিদ্র এবং একান্তই অসহায় একটি পরিবারের কন্যা হওয়ার ফলেই সুকুমারের পক্ষে তাকে এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল যে, তাতে সংশয় নেইঙ্গ ফলত, সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে সুকুমারের যে-বাছবিছার দেখা গেছে, সেটা যে নেহাৎই ঠুনকো এবং ভিত্তিহীন তাও এর থেকে প্রতীয়মান হয়েছেঙ্গ

তুলসীকে লালসার শিকার বানিয়ে, তারপর সমস্ত ঝামেলা এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে সুকুমার তাকে বেলেডোনা খাইয়ে হত্যা করে — এটাকে শ্রেণীগত চরিত্রলক্ষণ বললে হয়ত একটু বেশিই বলা হবেঙ্গ তবে খুন করার ব্যাপারটুকু ছাড়া বাকিটার মধ্যে মধ্যবিত্তের ধূর্ততা প্রতিভাত হয়েছে যে, সেটা অবশ্য বলাই যায়ঙ্গ মনোবিজ্ঞানীরা 'কপ্রোফিলিয়া' বলে এক ধরনের বিকারের কথা বলেন, যার ফলে যৌনাবদমন-জনিত কাররে হতকুৎসিতের প্রতিও এক সময়ে আকর্ষণ জন্মাতে পারেঙ্গ সুকুমারও তেমন মনোবিকারগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নয়ঙ্গ

অবরবর্গীয় অন্য চরিত্রদুটির মধ্যে নিতাই সহিসকে মোটামুটিভাবে অপ্রাসাকি বলেই গণ্য করা যায়ঙ্গ কিন্তু যদু ডোম সম্পর্কে সেকথা বলা যায় নাঙ্গ কাহিনীর সমাপ্তির মুহূর্তে তার অনুচ্চ কণ্ঠে যেন স্বয়ং মহাকাল তাঁর ক্রুদ্ধ বিদ্রুপ এবং ঘৃণা উদ্‌জীবিত করে দিয়েছেন ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে রেঙ্গ'' শেষ বিচারে সে, নিতাই এবং তুলসী যে একই শ্রেণী সীমানার অন্তর্গত এটা মনের গভীরে যদু ডোমের অনুভব না করার কথা নয়ঙ্গ সেই অনুভূতি, রূপান্তরিত হয়েছে তুলসীর প্রতি আর্থ-সামাজিক শ্রেণীতে প্রবল এক সহানুভূতিতেঙ্গ তাই কৈলাসডাক্তার যত ভাল লোকই হোক না কেন, শেষ বিচারে তিনিও তো সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ—যারা চিরকালই যদু-তুলসীদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে আসছে একদিকে; অন্যদিকে নির্মর্মভাবে শোষণও করে আসছেঙ্গ যদুর এই তীব্র ঝাঁঝের বিদ্রুপ তাই কেবলমাত্র আঁশটে রসিকতা নয়, তার স। স। আকণ্ঠ ঘৃণা এবং প্রতিবাদেরও দ্যোতক বলেই বুঝে নিতে হবেঙ্গ মুখে হরহামেশা ''হুজুর' বলে কৈলাসকে সম্বোধন করে বিনয় এবং সম্ভ্রম দেখানোর ভাণ করে সে ঠিকই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই নম্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অতলান্ত ঘৃণা এবং আক্রোশঙ্গ সেটা 'ব্যক্তি' কৈলাসের প্রতি নয়, তিনি যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত, তার প্রতিঙ্গ 'ব্যক্তি' কৈলাসকে (সম্ভবত) যদু-নিতাইদের অপছন্দ করার কোনো প্রত্যক্ষ হেতু নেই, কিন্তু সে-মুহূর্তে তাদের মনে পড়ে তিনি 'সুকুমারের বাবা'— তখনই মনের গহনে তাঁর সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট বিরূপতা সঞ্জাত হয়ঙ্গ সুকুমার যেহেতু এখানে প্রতিভাত হচ্ছে, তাদের কাছাকাছি থাকা আর্থ-সামাজিক স্তরভুক্ত একটি নিরপরাধ কিশোরীর ধর্ষক এবং হত্যাকারী রূপে, তখন সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিই তাদের এক ধরনের অসহায় কিন্তু অপরিমিত আতীব্র আক্রোশ বিষিয়ে দেয় সমস্ত মানসিকতাটাকে; আর সেটারই প্রকাশ ঘটেছে যদূর ঐ শ্লেষতিক্ত টিপ্পনীর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণেঙ্গ মাত্র একটি ছয় শব্দের বাক্যের মাধ্যমে এমন একটা প্রচণ্ড শ্রেণীবিরোধের মানসকিতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়াটা নিঃসন্দেহে লেখকের অসাধারণ দক্ষতার দ্যোতনা বহন করেঙ্গ

এই আলোচনা সা। করার আগে আরো একটি বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলা বাঞ্ছনীয়ঙ্গ তুলসীর ময়নাতদন্তের যে-অগ্নিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ, তার মধ্যে একই স। ভাষাকুশলী এক শিল্পীর দক্ষতা এবং শারীরবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন মানুষের পাণ্ডিত্য সুসমন্বিত হয়ে উঠেছেঙ্গ ডাক্তারী শাস্ত্রে প্রচলিত লাতিন নামগুলির বদলে চরক-সুশ্রুতের প্রাচীর গ্রন্থে প্রাপ্যঙ্গ সংস্কৃত শারীরবিদ্যাকেন্দ্রিক শব্দাবলীর এই সুষ্ঠ প্রয়োগ — মৃতদেহের ময়নাতদন্তের মতো একটা বীভৎস রকমের অস্বস্তিকর ব্যাপারকেও শিল্পরসেমরিডত করতে পেরেছেঙ্গ পাঠকের কাছে সেটা অবশ্যই অতিরিক্ত একটা পাওনা অবশ্যইঙ্গ

৪১.৭ অনুশীলনী

☐ বিস্তৃত আলোচনামূলক ☐

১) 'সুন্দরম' শিরোনামটি গল্পের পক্ষে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বলুনঙ্গ

২) সুন্দরের সংজ্ঞা কৈলাস ডাক্তারবাবুর উপলব্ধিতে কীভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে, আলোচনা করুনঙ্গ

৩) 'সুন্দরম' গল্পে সমাজ-মন এবং ব্যক্তিমন কীভাবে দুয়েরই বিকলন করেছেন সুবোধ ঘোষ, আলোচনা করুনঙ্গ

৪) সুকুমার ছেলেটি শয়তান, না মনোবিকারগ্রস্থ — বুঝিয়ে বলুনঙ্গ

৫) তুলসীর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য সুকুমারদের পরিবার এবং সুকুমার স্বয়ং, কার দায়িত্ব বেশি, কার কম, আলোচনা করুনঙ্গ

৬) 'সুন্দরম' গল্পের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কূটৈষণা প্রবলতর শক্তি হিসেবে প্রতীত হলেও, আর্থ-সামাজিক বিভেদের শ্রেণীচেতনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় — আলোচনা করুনঙ্গ

৭) কৈলাস ডাক্তার এবং তাঁর ছেলে সুকুমার, মানুষ হিসেবে দুটি পরস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থানে আছেন; একই পরিবেশে, একই পরিবারের পরস্পরার মধ্যে থেকেও এই বৈপরীত্য কেন, বুঝিয়ে বলুনঙ্গ

৮) ''সুবোধ ঘোষের ভাষাশৈলী একটি অনন্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে 'সুন্দরম' গল্পেঙ্গ'' —আলোচনা করুনঙ্গ

☐ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ☐

১) যতগুলি মেয়েকে সুকুমারের সম্ভাব্য পাত্রী হিসেবে দেখা হয়েছিল, তাদেরকে কী কী ছুতো দেখিয়ে অমনোনীত করা হয়?

২) সুকুমারের 'ব্রহ্মচর্য' কীভাবে চলত, বলুনঙ্গ

৩) 'পুরুতমশাই' এবং 'দৈবজ্ঞী' সুকুমারের বিয়ে সম্পর্কে কী কী অভিমত দিয়েছিলেন বলুনঙ্গ

৪) কানাইবাবুর তালিমে সুকুমারের কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

☐ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ☐

১) ''অদ্ভুত আত্মিক শক্তির রেচকস্পর্শ'' সুকুমার কোথায় কোথায় অনুভব করেছিল?

২) সুকুমার সম্পর্কে তার বাবা কী বলতেন?

৩) কানাইবাবু সুকুমারকে কোন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

৪) বনলতারা কোথায় থাকত?

৫) সিনেমায় কার নাচ পছন্দ করত সুকুমার?

৬) তুলসীরা কোথায় থাকতে চেয়েছিল?

৭) অনুপমা সম্পর্কে রাণু কী মন্তব্য করেছিল?

৮) সুকুমার কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেছিল?

৯) কৈলাসবাবুর ডিসপেনসারী থেকে কী হারিয়েছিল?

১০) সুকুমারের কার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ের ঠিক হয়?

১১) কৈলাস ডাক্তার কিসের পাকা জহুরী?

১২) পোখরাজের দানার সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

১৩) 'সুন্দরম' গল্পের ঘটনাকাল কখন?

১৪) তুলসী কবে মারা গিয়েছিল?

১৫) তুলসী কার মেয়ে?

১৬) ক্লোমরসে মাখা কিসের পিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল?

৪১.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের শেষাংশ অনুসরণে উত্তর করুনঙ্গ

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের প্রথম অংশ অবলম্বনে উত্তর দিনঙ্গ

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছেঙ্গ সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিনঙ্গ

৪) মূলপাঠ এবং আলোচনার প্রথম পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছেঙ্গ তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরী করুনঙ্গ

৫) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আছেঙ্গ তার সাহায্যে উত্তর দিনঙ্গ

৬) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছেঙ্গ তার সাহায্যে উত্তর দিনঙ্গ

৭) কৈলাস ও সুকুমারের বিপ্রতীপ অবস্থানের কারণ দু'জনের বয়স ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণাঙ্গ প্রথমজন ডাক্তার ও লাসকাটা তার অন্যতম কাজঙ্গ তিনি মন-নিয়ে চর্চার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকের

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনকে দেখেছেনঙ্গ সুকুমার অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণার বশবর্তীঙ্গ আশৈশব সনাতন জীবন যাপন করেছেঙ্গ কতকগুলি অন্ধ প্রত্যয় নিয়েঙ্গ বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে শেষে উপলব্ধি করেছে —মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাইঙ্গ

৮) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ে 'সুন্দরের' ব্যাখ্যা প্রস। অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুনঙ্গ

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ অনুসরণে বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতাকে দেখে সুকুমারের আচরণ ব্যাখ্যা করে উত্তর দিনঙ্গ

২) ৩),৪) — মূলপাঠ অনুসরণে উত্তর করুনঙ্গ

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজনঙ্গ মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেনঙ্গ অবশ্যই একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখবেনঙ্গ

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) সুবোধ ঘোষ — *শ্রেষ্ঠ গল্প* (*জগদীশ ভট্টাজার্য সম্পাঃ*)

২) অরিন্দম গোস্বামী — *সুবোধ ঘোষ ঃ কথা সাহিত্য*

৩) উত্তম ঘোষ — *সুবোধ ঘোষা ঃ বড় বিস্ময় জাগে*

৪) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের পুত্তলিকা*

৫) সরোজ মোহন মিত্র — *ছোট গল্পের বিচিত্র কথাঙ্গ*

৬) সুবোধ ঘোষ — *অযান্ত্রিক শিল্পী ঃ সম্পাদনা উত্তম পুরকাইত*